চোখের যত্ন

ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুর রহিম চৌধুরী
এম. বি. বি. এস. (ঢাকা); এফ. আই.
এ. সি. এস. (ই); ডি. ও. (আর.
সি. এস.; আর. সি. পি.) লণ্ডন,
সহযোগী অধ্যাপক, চক্ষু বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রকাশকাল

বৈশাখ, ১৩৭১

প্রকাশক

ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণ

মুজীবুর রহমান
মুরাদ প্রেস
১, বি. কে. গাঙ্গুলী লেন,
(কায়েৎটুলী) ঢাকা-২

প্রচ্ছদ : নাসির বিশ্বাস

CHOKHER JATNA (Care of Eyes) : by Dr. Md. Abdur Rahim Chowdhury. Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh.

ভূমিকা

শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শরীরের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। কোন অঙ্গকেই আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। যে-কোন অঙ্গে আঘাত লাগলে বা অসুখের সূত্রপাত হলে আমরা সেই অঙ্গের প্রয়োজন যে কত অধিক তা উপলব্ধি করতে পারি। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝা যায় না বলে একটি কথা আছে। কথাটি সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেই সমানভাবে সত্য।

তবে চোখের গুরুত্ব আরো একটি কারণে আমাদের নিকট সমধিক। চোখ মানব বা প্রাণী জীবনের দরজা। এই চোখ দিয়েই সমগ্র বিশ্ব আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করছে। চক্ষু না থাকলে পৃথিবী যে কী তা আমরা জানতে পারি না, বুঝতে পারি না। চোখ আছে বলেই কবির ভাষায় আমাদেরো বলতে ইচ্ছে করে 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। চোখ না থাকলে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের অমন সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর বিবেচনা করতেন না এবং ভারতীয় উপমহাদেশে এতো সমৃদ্ধ সাহিত্যও বৈষ্ণব-চেতনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতো না। চোখ ছিল বলেই বেহুলা তাঁর মৃত স্বামীর লাশ নিয়ে অসীমের সন্ধানে নদীতে ভেসেছিলেন, ফরহাদ পাহাড় কাটতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, মজনু হয়েছিলেন দেওয়ানা। অবশ্য চোখ আমাদের সবারই আছে, কিন্তু অমন চোখ সবারই থাকে না। চর্ম-চোখ দিয়ে সৌন্দর্য মর্মে প্রবেশ করে আর সৃষ্টি করে যে মহিমাময় অনুভূতি তার নাম প্রেম। কেউ কেউ প্রেমিক, সবাই আমরা প্রেমিক নই।

অন্তরেও যে একটি চোখ আছে তার কথা আপাতত ছেড়েই দিই। কেননা চিকিৎসার জন্য সেই চোখের কোনো মুল্য নেই, যার আছে সে আমার এই ভুবন মন-মোহিনী সৌন্দর্যের বহিরঙ্গে

দৃষ্টি ছড়ানো দুটো আঁখি। আনন্দে তারা সজল হয়ে ওঠে আবার দুঃখে হয়ে ওঠে অশ্রুভারাক্রান্ত। কিন্তু তাদেরও ভালো থাকা মন্দ থাকা আছে, আছে অসুখ বিসুখ। অসুখে প্রয়োজন ডাক্তারের। আমার কিছুমাত্র যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও যে-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখছি তার লেখক এমনি একজন ডাক্তার—ডাক্তার আব্দুর রহিম চৌধুরী। ডাক্তার চৌধুরীকে সাধারণ অর্থে একজন চক্ষু চিকিৎসক বললে ভুল বলা হবে—তিনি যথার্থ অর্থেই একজন নিষ্ঠাবান চক্ষুবিশারদ। দেশে এবং বিদেশে অধীত জ্ঞানকে একমাত্র পুঁজি করেই তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে বুক ফুলিয়ে বিচরণ করছেন না—এই জ্ঞানের সীমান্তকে তিনি নব নব সাধনার দ্বারা প্রসারিত করে চলেছেন। তিনি পড়াশুনো করেন। আর এ কারণেই চক্ষু চিকিৎসায় তিনি এক বিরল খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই দেশের পরিবেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সেদিকেও তিনি পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এমন একজন ডাক্তারের লিখিত চক্ষু-চিকিৎসা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ যে এদেশের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ পাঠকদের উপকার সাধন করবে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। গ্রন্থটি অবশ্য শুধু বিশেষজ্ঞদের জন্য লিখিত নয়—যাঁরা অ-ডাক্তার এবং অ-পণ্ডিত তাঁদের সাধারণ জ্ঞানকে সামনে রেখেই লেখক তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তথাপি অন্যেরাও যে কিছু শিক্ষণীয় উপাদান পাবেন না এমন নয়। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

মযহারুল ইসলাম
উপাচার্য
রাজশাহী, বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

চোখের ক্রমবর্ধমান অবস্থা

চোখের রোগীদের লইয়া নাড়াচাড়ায় আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে অনেক লোকই আছে যাহারা চোখের যত্ন লইতে চান তবে কিভাবে তাহা লইতে হইবে সে সম্পর্কে তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা নাই ; অথবা একটি ক্ষীণ ধারণা রহিয়াছে। নিশ্চিতভাবেই জ্ঞানের অভাবে বহু লোকই চোখের নানা রোগে ভোগে আর কোন কোন অবহেলাও ইহার কারণ।

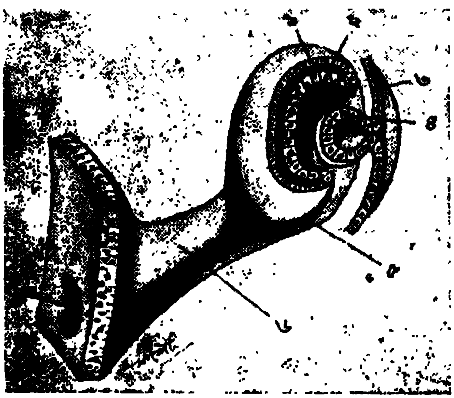
যাঁহারা নিজেদের দৃষ্টিশক্তির অসুবিধাকে অবহেলা করেন তাঁহারাও অজ্ঞতারই শিকার। তাঁহারা জানেন না ইহার পরিণতি কত ভয়াবহ। আমার এই ধারাবাহিক নিবন্ধ সেসব মানুষের কিঞ্চিৎ সাহায্যের প্রয়াস যাহারা নিজেদের চোখকে ভালো রাখিতে চান।

আলোচনায় মনোযোগের পূর্বে চোখের ক্রমবর্ধমান অবস্থা সম্বন্ধে সামান্য রেখাপাত প্রয়োজন।

ভ্রূণের ক্রমবর্ধমান অবস্থা অত্যন্ত দ্রুতশীল। স্বল্প সময়ের ভিতরে অর্থাৎ প্রায় দুই শত আশি দিনের ভিতরে কোষের বিভক্তি এমনভাবে হইতে হয় যেন কোষ-সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০০০ হয়। ইহাতে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই সৃষ্টি হয়। চোখ মস্তিষ্কেরই অংশ হইতে আলাদাভাবে গঠিত হইতে থাকে এবং ইহার সাথে অন্যান্য তন্তুও থাকে। ভ্রূণের যে অংশ হইতে মস্তিষ্ক বর্ধিত হয় তাহাকে নিউরাল একটোডারম বা মেডোলারি প্লেট (Medulary plate) বলে। এই নিউরাল একটোডারম যখন একটি নলের আকৃতি ধারণ করে তখন ইহা সারফেস একটোডারম হইতে পৃথক হইয়া নিউরাল টিউবে (Neural tube) পরিণত হয়। এই নিউরাল

টিউবের মস্তকভাগের অংশ বর্ধিত হইয়া মস্তিষ্ক তৈয়ারী হয়। চোখ আংশিক একটোডারমাল এবং আংশিক মেসোডারমাল। একটোডারমাল ভাগ নিউরাল টিউব হইতে এবং কিছুটা সারফেস একটোডারম হইতে বর্ধিত হয়।

অক্ষিপট (Retina) অক্ষিস্নায়ু (Optic nerve) ইত্যাদি নিউরাল একটোডারম হইতে বর্ধিত হয়। সারফেস একটোডারম হইতে পুতলী (Lens) করনিয়াল এপিথেলিয়াম (Corneal epithelium) ল্যাকরিমাল (Lacrimal) ও টারমাল এপিথেলিয়ামের (Tarmal epithelium) সৃষ্টি হয়। চোখের বাকী অংশগুলি মেসোডারম



১। অপটিক কাপের বহিঃস্তর
২। অপটিক কাপের অন্তস্তর
৩। একটোডার্ম
৪ লেন্স্ ভেসিক্যাল
৫। ফিটাল ফিসার
৬। অপটিক স্টক
৭। লুমেন অব অপটিক স্টক

ছবি ক

হইতে সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ ২ মিঃ মিঃ মাপের ভ্রূণে নিউরাল একটোডারমের সম্মুখভাগের দুই দিকে দুইটি ছোট গর্ত দৃষ্টিগোচর হয় ইহাকেই অপটিক গ্রুভ (Optic groove) বলে। পরবর্তী সময়ে এই গ্রুভ (Groove) হইতে চোখের বিভিন্ন অংশ বর্ধিত হইতে থাকে। অপটিক গ্রুভ হইতে অপটিক ভেসাইকেলের সৃষ্টি হয়। নলের সংকোচন হইয়া চোখ মস্তিষ্ক হইতে আলাদা হইয়া যায়। এই সংকুচিত অংশই অক্ষিস্নায়ু (Optic nerve), অপটিক

কারাসমা (Optic chaisma) ; অপটিক ট্রাকট (Optic tract) হিসাবে চক্ষুকে মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত রাখে (ছবি ক)।

ছবি - খ-তে বিভিন্ন অংশের ক্রমবর্ধন দেখানো হইয়াছে।

নিম্নের তালিকায় অংশবিশেষের ক্রমবর্ধমান এবং পূর্ণতার সময় দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	মাপ	বয়স (গর্ভাবস্থায় বা জন্মের পূর্ব-অবস্থায়)
১। অপটিক পিট এবং অপটিক ভেসিকের সৃষ্টি	৩ মি. মিঃ	৩ - ৬ সপ্তাহ
২। লেন্সপিট এবং অপটিক ট্রাক্টের সৃষ্টি	১৪ মি. মিঃ	৬ "
৩। সারফেস একটোডারম থেকে লেন্সের পৃথকিকরণ	১৪ মি. মিঃ	৬ "
৪। সিলিয়ারী মাংসপেশী এসক্লেরা সিলিয়ারী বডি এবং করয়েডের সৃষ্টি	১১০ মি. মিঃ	৪ "
৫। পিউপিলার মেমব্রেনের লুপ্তি	২৫০ মি. মিঃ	৭ "
৬। হায়ালোয়েড ধমনীর লুপ্তি	৩০০ মি. মিঃ	৯ "

জন্মের সময়ে চোখের অংশগুলির বর্ধন এই অবস্থায় থাকে। জন্মের পরবর্তী ৪ হইতে ৬ মাসের ভিতর রেটিনা এবং তাহার সর্বোচ্চ সংবহনশীল মেকুলা লিউটিয়া বর্ধনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

স্বাভাবিক বা ভাল দৃষ্টি

যে অবস্থায় যে দৃষ্টিশক্তি থাকা উচিত সে বয়সে সেরূপ দৃষ্টিশক্তি থাকিলে তাহাকে ভাল দৃষ্টি বলা যায়। পর-পৃষ্ঠায় জন্ম হইতে জীবনের বিভিন্ন স্তরে দৃষ্টিশক্তির যে পরিবর্তন ঘটে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

(ক) জন্মের পর

জন্মের ঠিক পর চোখ কোন জিনিসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে পারে না। উভয় চোখ নিজেদের যোগাযোগ রাখিয়া ঘোরাফিরা করিতে পারে না। চোখের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ রেটিনা, মেকুলা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করে না। রেটিনা বা অক্ষিপট অক্ষিগোলকের সবচেয়ে পিছনের দিকের অংশ। ইহা আলোকপাতে স্পন্দিত হয় এবং ইহার দ্বারা আলোক-অনুভূতি অক্ষিস্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্কে পৌঁছায়। ইহা আলো অনুভূতিকে (Light sensation) স্নায়ু-তড়িতে (Nerve impulses) পরিবর্তিত করে। চোখ দূরদৃষ্টিভুক্ত থাকে।



১। ভিট্রিয়াস
২। রেটিনা
৩। একটোডার্ম
৪। প্রিমোর্ডিয়াম অব কর্নিয়া

ছবি — খ

(খ) পাঁচ মাস বয়সে

১। কোন জিনিসের দিকে ঠিকমত চাহিয়া থাকিতে পারে।

২। দৃষ্টি তখনো দূরপ্রবণ (Hypermetropic)।

(গ) **পাঁচ বৎসর বয়সে**

১। চোখের পরিপূর্ণতা শেষ হয়।

২। তখনও শিশু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন থাকে।

৩। দুই চোখ নিজেদের ভিতরে যোগাযোগ রাখিয়া কাজ করে।

৪। দ্বিঅক্ষি দৃষ্টি বা বাইনোকুলার ভিসন (Binocular vision)-এর জন্য যাহা দরকার তাহা ছয়মাসের ভিতরেই শেষ হয়।

৫। Reflex Activity দুই বৎসরেই শেষ হয়।

পাঁচ বৎসর বয়সে চোখের পরিপূর্ণতা লাভ করিতে আর বাকী থাকে না।

বিভিন্নভাবে চোখের পরিপূর্ণতা পদ্ধতিতে ব্যাঘাত ঘটা পৃথক-ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

(ঘ) **বয়সন্ধিতে** (যৌন ক্ষমতা বিকাশের সময়)

এ সময় দৃষ্টিশক্তি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত হয়, যাহাকে আমরা স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞদের ভাষায় যাহাকে ৬/৬ (6/6) বলা হয়। সংক্ষেপে ইহা হইল স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি বিকাশের প্রক্রিয়া। আর এই দৃষ্টিশক্তি ভাল দৃষ্টিশক্তি।

(ঙ) **পঁয়ত্রিশ (৩৫) বৎসর বয়স পর্যন্ত**

আমাদের দেশে সাধারণতঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত দৃষ্টি-শক্তি স্বাভাবিক থাকে। এই বয়স অতিক্রম করিবার পর ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য দৃষ্টিশক্তির নিকট বিন্দু আরো দূরগামী হয়। পঁয়ত্রিশ (৩৫) বৎসরের উর্ধ্ব বয়সের লোকেরা আগের তুলনায় আরো দূরে রাখিয়া বস্তু দেখিতে ও পড়িতে পারেন। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই, বয়স্ক লোকদের পড়ার দূরত্ব বাড়িয়া যায়। আরামটাই বড়

কথা যখন আরামদায়ক সহজ দৃষ্টি চোখকে নানাভাবে মানাইয়া লইয়াও হাত দুইখানার সাহায্যপ্রার্থী হয় তখনি আমরা তাহাকে 'Presbiopia" অর্থাৎ চালসে লাগা বলিয়া থাকি। আরও অনেক পরিবর্তন ঘটে যার শেষ পরিণতি বিভিন্ন সীমানা নির্ধারক। চোখ এই সমস্ত পরিবর্তন হইতে বাদ পড়ে না। বেশী বয়স চোখের পুতলিকে (Lens) শক্ত বানায় এবং যে মাংসপেশী পুতলিকে আকারে পরিবর্তিত করে, তাহাকে দুর্বল করিয়া ফেলে ইহাতেও দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তন ঘটে। স্বাভাবিক দৃষ্টি একটা নির্ধারিত মাত্রা নহে। ইহা বয়সের আনুপাতিক। এই Standard বা মান হইতে যে-কোন ব্যতিক্রমই হইল অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি একটা স্থায়ী নির্ধারক নয় এবং ইহা বয়স সাপেক্ষ। এই নির্ধারিত দৃষ্টিশক্তির যে কোন ব্যতিক্রমই হইল অস্বাভাবিক প্রকাশ। ইহাকে আমরা খারাপ দৃষ্টিশক্তি বলিব না কেননা ইহা আরও কতকগুলি খারাপ অবস্থাকে বুঝায়, নিকট কাজের জন্য যে দৃষ্টিশক্তি বুঝায় তাহা একটা আলাদা ধরনের। এই উদ্দেশ্যে চোখকে ঠিক জায়গা মতো আলো প্রতিফলন ক্ষমতা রাখিতে হইবে যাহার জন্য চোখের ভিতরের (ক) সিলিয়ারী মাংসপেশীর (Ciliary muscle) কার্যক্রমে (খ) পুতলিকে (Lens) তাহার আকার পরিবর্তন করিতে হয়। অল্প বয়সে নিকট বস্তুকে দেখিতে ঝাপসা বা ঘোলাটে মনে হয় না, বরং পরিষ্কার দেখায়। চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ ইহা নির্ধারণের জন্য নানা রকমভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বয়ঃসন্ধিক্ষণে বা (সাবালক অবস্থায়) কোন ক্ষুদ্র বস্তুকে তিন ইঞ্চি দূর হতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। যে সব উপায়ে এই পরিবর্তনগুলি ঘটিয়া থাকে সেইগুলিকে দৃষ্টি 'উপযোজন' (Accommodation of vision) বলা হয়। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে এই দুরত্বও বাড়িয়া যায়। নিকট দৃষ্টির দুরত্ব যখন অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায়

এবং স্বাভাবিক কাজের ব্যাঘাত ঘটায় তখন বুঝিতে হইবে চোখে চালসে (Presbiopia) লাগিয়াছে। উপরে বর্ণিত দুইটি কারণ (ক' ও খ') যাহা নিকটদৃষ্টি নির্ধারক, যদি কোন কারণে প্রভাবান্বিত হয়, তাহা হইলে এই পরিবর্তন ঘটিতে পারে। বয়ঃবৃদ্ধি ইহাদের অন্যতম, যাহার প্রতিকূলে এই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে তাই বিভিন্ন বয়সে আরামদায়ক নিকটদৃষ্টি ক্ষমতা বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। বয়সের তারতম্য অনুসারে নিকটদৃষ্টি ক্ষমতার দূরত্ব নীচে বর্ণিত হইল।

১। **শৈশবে ঃ**

৭ সেণ্টিমিটার (প্রায় তিন ইঞ্চি)

২। **ছত্রিশ বৎসর বয়সে ঃ**

১৪ সেন্টিমিটার (প্রায় ছয় ইঞ্চি)

৩। **পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ঃ**

২৫ সেন্টিমিটার (প্রায় দশ ইঞ্চি)

৪। **ষাট বৎসর বয়সে ঃ**

৩৩ সেণ্টিমিটার (প্রায় ১৩ ইঞ্চি)

চোখের উপরে গর্ভাবস্থা শিশুর জন্ম এবং স্তন্যদান কাল-এর ফলাফল ঃ

গর্ভাবস্থা (Pregnancy)

গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে থাইরয়েড গ্রন্থির (Thyroid gland) কার্যক্ষমতা বাড়িয়া যায়। থাইরয়েড গ্রন্থি গলার সম্মুখভাগে এবং কণ্ঠমণি বা টুটির ঠিক নীচেই অবস্থিত। ইহার কার্যাধিকতার জন্য আঁখিপল্লব (Eye lids) সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া আঁখি গোলকও (Eye ball) বাহিরের দিকে বাহির হইয়া আসে।

ইহাকে Proplosis বলা হয়। পিটুটারী একটি গ্রন্থি (Pitutary gland) যাহা মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত। ইহা আয়তনে বাড়িয়া গেলে অক্ষিস্নায়ুর (Optic nerve) উপরে চাপ দেয় ফলে দৃষ্টি-শক্তির ব্যাঘাত ঘটে।

Eclampsia ও Preeclampsia রোগে মায়েদের মাথাব্যথা মাথাঘোরা দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত পা ফুলিয়া যাওয়া ইত্যাদি উপ-সর্গ দেখা যায়। এই রোগে অক্ষিপটে (Retina) রক্তক্ষরণের ফলে দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ইহাকে রুগ্ন অক্ষিপট বা (Retinopathy) বলা হয়। গর্ভাবস্থায় সর্বক্ষণ বমনের ফলে অক্ষি স্নায়ুতে প্রদাহের (Optic neuritis) সৃষ্টি হয়। ইহাতে অক্ষি-পটে বা অক্ষিপটের নীচে রক্তক্ষরণ হইয়া থাকে। ইহা অস্থায়ি-ভাবে আংশিক দৃষ্টিহীনতা ঘটায়, সেই সঙ্গে চক্ষু সংলগ্ন অন্যান্য ব্যাঘাতও ঘটাইতে পারে।

স্তন্যদানকালে (লেকটেশন)

মায়ের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া (দুগ্ধবতী অবস্থা) সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরিয়া সন্তানকে বুকের দুধ দিতে হইলে একমোডেশনের দুর্বলতা এবং দৃষ্টিদৌর্বল্য দেখা দিতে পারে। নিকটের বস্তু দর্শনে চোখের শ্রান্তির ভাব, ব্যথা, অস্পষ্টতা ও অস্বস্তি দেখা দেয়। মায়ের বুকের দুধ পান করিয়া শিশুর রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টির সকল উপাদান লাভ করে। তাহার বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলি মায়ের বুকের দুধ হইতেই আসে। শিশুর সবচাইতে পুষ্টিকর খাদ্য হইল মায়ের বুকের দুধ। প্রকৃতি শিশুর পুষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান মায়ের দুধের মধ্যে সরবরাহ করে। অতিমাত্রায় সবকিছুই খারাপ। তাই দীর্ঘদিন ধরিয়া মায়ের দুধ পান করানোটাও মা ও শিশু উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর।

কি কি সতর্কতা নিতে হইবে

১। **গর্ভাবস্থায় সতর্কতা**

নিম্নে বর্ণিত খাদ্য মাতাকে সরবরাহ করিতে হইবে :

খাদ্য তালিকা

প্রযোজনীয় পুষ্টি	গর্ভাবস্থার আগে	গর্ভাবস্থায়	ল্যাকটেশন
১। ক্যালোরি	২,৩০০	২,৭০০	৩,৩০০
২। প্রোটিন গ্রাম (gm)	৫৫ গ্রাম	৮০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
৩। ক্যালসিয়াম গ্রাম (gm)	০ ৮ গ্রাম	১'৫ গ্রাম	[illegible] গ্রাম
৪। লৌহ মিঃ গ্রাম (mgm)	১২ মিঃগ্রাম	১৫ মিঃগ্রাম	১৫ মিঃগ্রাম
৫। ভিটামিন এ-১ আই ইউ (I.u)	৫০০০ আই.ইউ(I.u)	৬০০০ আই ইউ	৮০০০ আই ইউ.
৬। থিয়ামিন মিঃ গ্রাম	১'২ মিঃগ্রাম	১'৫মিঃগ্রাম	১ ৫মিঃগ্রাম
৭। রিবোফ্লাবিন মিঃগ্রাম	১'৪ মিঃগ্রাম	২'০ মিঃগ্রাম	২'৫মিঃগ্রাম
৮। নিয়োসিন মিঃগ্রাম	১২ মিঃ গ্রাম	১৫মিঃগ্রাম	১৫মিঃগ্রাম
৯। এ্যাসকরবিক এ্যাসিড	৭০ মিঃগ্রাম	১০০মিঃগ্রাম	১৫০মিঃগ্রাম
১০। ভিটামিন 'ডি' মিঃগ্রাম	....	৪00আই.ইউ	৪00আই. ইউ

নিয়মিতভাবে মায়ের রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করিতে হইবে, ওজন লইতে হইবে রক্তচাপ লইতে হইবে। নিয়মিতভাবে মিডওয়াইফ বা শিক্ষিত নার্সদের দিয়া মাকে পরীক্ষা করাইতে হইবে।

২। সন্তান প্রসবকালে সতর্কতা

মায়ের শরীর পরীক্ষা চলিতে থাকিবে। মা ও শিশুর তদারকের জন্য নিয়মিত মিডওয়াইফ নিয়োগ করিতে হইবে। কষ্টসাধ্য প্রসবকালে মা ও শিশুর বিপদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রকৃতি সব রকম চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থা রাখিয়াছে। মাকে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিলে এবং এই সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দিলে কোন অসুবিধা থাকিবে না।

৩। ল্যাকটেশন পিরিয়ডের সতর্কতা

ল্যাকটেশনের স্বাভাবিক সময় হইল ৮ মাস। এই সময়টাতে মায়ের দুধ শিশুর জন্য শুধু ভাল খাদ্যই নয়, বরং বংশগত সকল দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য এই সময়েই হইয়া থাকে। এই সময়ে মায়ের দুধ মা ও শিশুকে দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়া সুস্থ রাখে। এইটা প্রাকৃতিক গর্ভনিরোধেরও উপায়। উপরোক্ত তালিকা মোতাবেক মাকে খাদ্য দিতে হইবে।

৪। প্রসবের আগে (Antinatal) **সতর্কতা**

শিশুর দৃষ্টিশক্তি সুস্থ রাখার জন্যে শিশুর জন্মের আগেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং শেষতক চালাইতে হইবে। এই পৃথিবীর সব সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগের জন্য পৃথিবীতে আসার আগে সুন্দর দৃষ্টিশক্তি লাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভাবী পিতা ও মাতাকে সবরকমের যৌন রোগ হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে। যৌন রোগ, বিশেষ করিয়া 'সিফিলিস' চোখের অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির মূল কারণ। ভবিষ্যৎ বংশধরের স্বাস্থ্য এবং সবরকম চিন্তা-ভাবনা মুক্ত থাকিতে হইলে ভাবী মাতাপিতাকে যৌন রোগমুক্ত থাকিতে হইবে। রোগ নিরাময়যোগ্য চিকিৎসা সহজলভ্য। যথা সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ ও চিকিৎসা

সবরকম চিন্তা-ভাবনা হইতে মনকে মুক্ত রাখিবে। সে-সব চিন্তার জন্য তাহারা নিজেরাই দায়ী। পিতামাতার দোষে যদি শিশু দৃষ্টিশক্তি হারায়, তাহার কোন কৈফিয়ত নাই। জননেন্দ্রিয় হইতে কোন ক্ষরণ ঘটিলে তাহা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের গোচরে আনিতে হইবে। 'যথোপযুক্ত চিকিৎসা চোখকে রক্ষা করিতে পারে।' 'গণোরিয়া' নিরাময়যোগ্য ব্যাধি। নবজাতকের চোখে গণোরিয়ার সংক্রমণ মারাত্মক এবং বহু ক্ষেত্রেই শিশু দৃষ্টিশক্তি হারায়। মায়ের প্রসবনালীকে এই রোগ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে।

আসন্ন প্রসবা মাকে সব সময় রোগ জীবাণুর কবল হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে। বিশেষ করিয়া হাম বা এই জাতীয় রোগের আক্রমণ হইতে। উপরোক্ত ধরনের রোগে মা আক্রান্ত হইলে শিশুর চোখে ছানি পড়িতে পারে। মাকে অবশ্যই পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হইবে। কারণ মায়ের পুষ্টির অভাব সন্তানের চোখের ক্ষতি করিতে পারে।

৫। জন্মের পর ও শৈশব অবস্থা

(ক) সকল খেলনা ও লেখার সরঞ্জাম হইতে হইবে মসৃণ। একই সাথে অথবা একই খেলনাতে রং-বেরং পরিত্যাজ্য। যেসব খেলনায় স্থির দৃষ্টি দিতে হয়, সেইসব খেলনা ৮ মাসের আগে দেওয়া উচিত নয়।

(খ) খেলনা মোটামুটি একই রং-এর হওয়া দরকার। শিশুর বয়স যত বাড়িবে শিশু ততই নানান রং-এর ও রকমের দ্রব্যাদি নাড়াচাড়া করিতে শিখিবে।

(গ) শিশুর বয়স ২ বৎসর হওয়ার আগে বিভিন্ন রং-এর ও ধরনের আঁকাবাঁকা খেলনা না দেওয়াই ভাল।

(ঘ) শিশুর চোখের যত্নের জন্য মায়ের প্রতি কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা :

নিম্নলিখিত অবস্থা যাহা ডাক্তারকে জানাইতে হইবে (যাহা করিতে হইবে)।

১। চোখের পাতা স্ফীতি (ফুলা)

২। চোখের লালবর্ণ হওয়া।

৩। চোখ হইতে রক্তক্ষরণ।

৪। চোখের পিচুটি হওয়া ও চোখের পাতা লাগিয়া যাওয়া।

৫। চোখ হইতে পানি ঝরা।

৬। চোখ উন্মিলণে অপারগতা।

৭। চোখের খুব কাছে খেলনা ধরাতে আগ্রহ।

৮। শিশু যদি কখনও সোজা তাকায় এবং অক্ষিগোলকের অবস্থা যদি একই রকমের না হইয়া পরস্পর ভিন্নমুখী হয়। (ট্যারা চোখ)।

৯। দুরের বস্তু যথা—পুর্ণিমার চাঁদ, চলমান মেঘ, নীল আকাশের মিটিমিটি তারা দেখিতে শিশুকে উৎসাহ দিতে হইবে।

১০। আলোর পানে তাকানোর অসুবিধা।

১১। শিশুর উচ্চতা অনুযায়ী যতদুর সম্ভব বই দূরে রাখিয়া পড়া-শুনা করিতে হইবে। শিশুর ঘাড় নোয়ানো চলিবে না।

যাহা নিষেধ

১। শিশু শ্রান্ত হইলে তাহার চোখকে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিৎ নয়।

২। খালি পেটে শিশুকে খেলিতে দেওয়া উচিৎ নয়।

৩। নাস্তার আগে শিশুকে পড়িতে দেওয়া উচিৎ নয়।

চোখের গোলক নরম হইলে তাহা দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি করে। কাজেই এই ধরনের অবস্থা এড়াইয়া চলিতে হইবে। যে-কোন রোগ বিশেষ করিয়া দাস্ত ও আমাশয় অক্ষিগোলক নরম করে। রোগ হইতে আরোগ্য লাভের সময় চোখের গোলক নরম থাকে। এই সময়টাতে নিকটের কাজে চোখের ব্যবহার পরিত্যাজ্য।

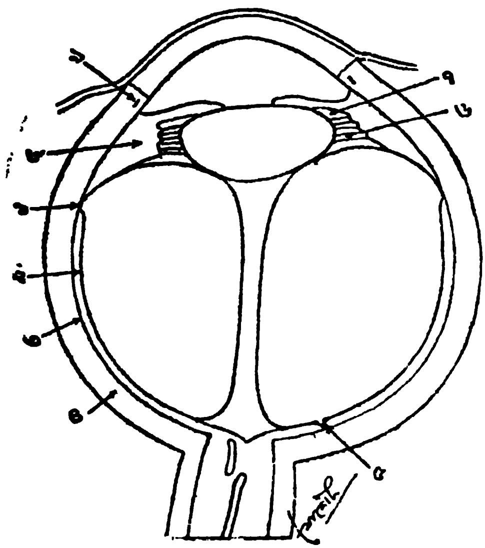
বিস্ময়কর অক্ষিগোলক

দৃষ্টিশক্তির বিস্ময়কর অংশ অক্ষিগোলক। চোখের মাধ্যমে কেমন করিয়া আমরা দেখিতে পাই তাহা জানিতে হইলে বিভিন্ন স্তরের সমন্বয়ে গঠিত চক্ষু ও তাহার চতুর্দিকস্থ দেহ বস্তুগুলির গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

মস্তকখুলির সম্মুখভাগে নাসিকা গহ্বরের দুইদিকে পিরা-মিডের মত আকৃতিবিশিষ্ট যে দুইটি গহ্বর আছে অক্ষিগোলক দুইটি তাহার মধ্যেই অবস্থিত। অক্ষিগোলক দুইটি চক্ষুপাতার দ্বারা আংশিকভাবে আচ্ছাদিত থাকে। এই দুইটি পাতার মধ্য দিয়া দৃষ্ট অংশকে আমরা সাধারণতঃ চক্ষু বলিয়া মনে করি। দুই পাতার সংযোগস্থলে গঠিত অন্তরমুখী ও বহির্মুখী কোণাকে যথাক্রমে ভিতর ও বাহির ক্যানথাস বলা হয়।

চোখের পাতা চর্ম, ভর দেওয়া কুশের স্তর এবং মাংসপেশীর সমন্বয়ে গঠিত। চোখকে ধূলাবালি হইতে রক্ষা করিবার জন্য চোখের পাতার কিনারাতে দুই-তিন সারি লোম থাকে তাহাকে অক্ষিপক্ষ্ম বলা হয় (চক্ষুপাপাতর লোম)। এই লোমগুলি সাধরণতঃ উপরের পাতাতে বেশী ও বড় থাকে। উপরের পাতার লোমগুলি উপরের দিকে ও নীচের পাতার লোমগুলি নীচের দিকে বাঁকানো থাকে। পাতার কিনারে চুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রপথে ছোট ছোট গ্রন্থি হইতে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হয়। ইহা চোখের পাতাকে ও চুলকে ঠিকমত রাখে। ভ্রূগুলি উপরের পাতাকে কপাল হইতে আলাদা করিয়া রাখে ইহার ফলে কপাল হইতে ঘাম গড়াইয়া চোখের ভিতরে পড়িতে পারে না। তদুপরি অতিরিক্ত আলো হইতে চক্ষুকে ছায়াদান ও ধূলাবালি হইতে চক্ষুকে রক্ষা করে। পাতার ভিতরদিক ও

অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগ একটি পাতলা সিক্ত পর্দাদ্বারা সংযুক্ত থাকে, ইহাকে 'কনজাংটাইভা' (সংযোজন ঝিল্লি) বলে। ইহা চোখের উপযুক্ত আচ্ছাদন এবং চোখের ভিতরে ধুলাবালি ঢুকিতে বাধা দান করে। তদুপরি চক্ষুপাতা ও চক্ষুগোলকের ঘর্ষণকে সীমিত করে। কনজাংটাইভাতে অনেকগুলি সরু রক্তনালী আছে। খালি চোখে ইহাদিগকে সহজে দেখা না গেলেও চোখেব অসুস্থ অবস্থাতে ভাল করিয়া দেখা যায় যাহার জন্য চক্ষুগুলি রক্তবর্ণ বলিয়া মনে হয়। চোখের ভিতরের কোণের দিকে একটা ক্ষুদ্র উঁচু জায়গা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে ক্যারাংক্যাল (Carancle) বলা হয়। ইহার বহির্ভাগে কনজাংটাইভাতে একটা চন্দ্রাকৃতি ভাঁজ দেখা যায় যাহার



১। অরা সিরেটা
২। রেটিনা (অক্ষিপট)
৩। করয়েড (কৃষ্ণমণ্ডলী)
৪। ইস্ক্লিরা
৫। ম্যাকুলা
৬। জমিয়ুস্ক
৭। পোস্টেরিয়ার চেম্বর
৮। সিলিয়ারী বডি
৯। ক্যানেল অব রিপ
১০। সেন্ট্রাল রেটিমান আর্টারী
১ । সেন্ট্রাল রেটিমাল ভেইন

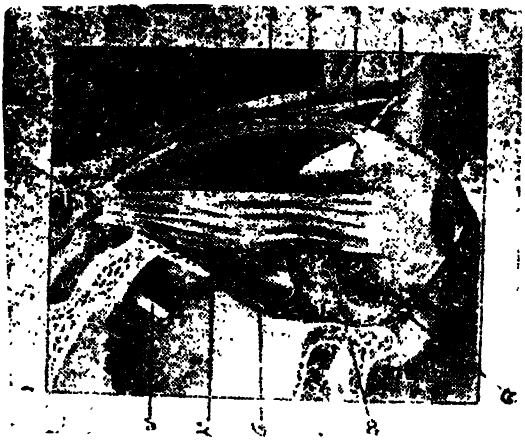
ছবি—১

নাম প্লাইকা সেমিলুনারিস (Plica seilunaris)। ইহাকে চোখের তৃতীয় পাতা বলা যাইতে পারে।

চোখের বাহিরের কোণের উপরের দিকে, অক্ষিকোটরের সম্মুখ ভাগে ও অক্ষিগোলকের উপরিভাগে একরকমের গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অশ্রু তৈয়ার করিয়া থাকে। চোখের পাতা পড়ার সাথে সাথে অশ্রু সম্পূর্ণ চোখের উপরে ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহাকে পরিষ্কার করাইয়া বাষ্পীভূত হইয়া যায়। যদি অতিরিক্ত অশ্রু তৈয়ার হইয়া থাকে তবে তাহা চোখের ভিতরের কোণে আসিয়া জমা হয় এবং পাতার কিনারে অবস্থিত দুইটি ছিদ্রপথে নাকের ভিতরে চলিয়া যায়। এই ছিদ্রগুলি খালিচোখেও দেখা যায়।

অক্ষিকোটর দেখিতে অনেকটা পিরামিডের মত যাহার চূড়া বা শীর্ষভাগ মস্তকের দিকে অবস্থিত। চূড়ার ছিদ্রটিকে অপটিক ফোরামেন বলা হয়। ইহার ভিতর দিয়া অপটিক নার্ভ বা অক্ষিস্নায়ু মস্তকের দিকে চলিয়া যায়। এই ছিদ্রের চারিদিকে একটি ছোট শক্ত পেশীর আংটি আটকানো থাকে। ছয়টি মাংসপেশীর সাহায্যে চক্ষু নাড়াচাড়া করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে রেকটাস (Rectus) নামক চারটি মাংসপেশীর উৎপত্তি হইতেছে এই আংটি হইতে। এই মাংসপেশীগুলির অপর প্রান্ত সামনের দিকে আসিয়া চক্ষুগোলকের চতুর্দিকে একটি উপরে একটি নীচে, আর দুইটি দুই পাশের দিকে শেষ হইয়াছে। অব্লিক নামের অপর দুইটি একটি উপরে, একটি নীচে মাংসপেশী আছে। উপরেরটি চক্ষুকোটরের চূড়া হইতে উঠিয়া ইহার ভিতরের দেওয়ালের পাশ দিয়া সামনের দিকে আসিয়া উপরের কোণে অবস্থিত ট্রকলিয়া নামক পেশীনির্মিত একটি কপিকলের ভিতরে ঢুকিয়া পরে পিছনের দিকে যাইয়া চক্ষুগোলকের উপরে আসিয়া শেষ হয়। নীচের অব্লিক মাংসপেশীটি গহ্বরের মেঝেতে অবস্থিত একটি নীচু জায়গা হইতে উঠিয়া আসিয়া চোখের মধ্যে শেষ হয় (ছবি ২)।

এতক্ষণ চক্ষুগোলকের চতুপার্শ্বস্থ জিনিসগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। এইবার অক্ষিগোলকের দিকে আসা যাক। প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাসের অক্ষিগোলকটি দেখিতে অনেকটা গোলাকার। চক্ষুগোলকের বাহিরের পাতলা আবরণটি বেশ শক্ত। ইহার আবার



ছবি — ২

১। পঞ্চম ক্রেনিয়েল স্নায়ুর ২য় ভাগ ২। ইনফিরিঅর অরবিটল ফিসার ৩। লেটারেল রেক-টাস মাংসপেশী ৪। ইনফেরিঅর অবলিকাশ মাংস-পেশী ৫। লেটারেল রেক্-টাস মাংসপেশী ৬। পোলি (কপিকল) ৭। সুপিরিয়র অব-লিক মাংসপেশী, ৮। সুপিরিয়র রেক্‌টাস মাংসপেশী, ৯। লেবাটর পালপেব্রি মাংসপেশী ১০। অপটিক ফোরামেন

তিনটি স্তর আছে। বাহিরের আবরণের সামনের দিকের ৬ ভাগের ১ ভাগ স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছভাগের নাম করনিয়া (অচ্ছদপট)। পিছনের বাকী পাঁচভাগের নাম এসক্লেরা (অস্বচ্ছ আবরণ) মধ্যখানের আবরণটি কৃষ্ণবর্ণ এবং সমস্তই রক্তনালীর দ্বারা গঠিত। এই আবরণের সম্মুখ-ভাগ আইরিস (কনিনিকা) নামে পরিচিত, এবং পিছনের ভাগ করয়্যাড বা কৃষ্ণমণ্ডল বলিয়া পরিচিত। মধ্যভাগের গোলাকার ছিদ্র অংশটি আইরিস দ্বারা বেষ্টিত। এই ছিদ্রকে পিউপিল বা চোখের তারারন্ধ্র বা তারা বলা হয়। ভিতরের স্তরটির নাম রেটিনা বা অক্ষিপট। এই স্তর হইতেই চক্ষুস্নায়ুর উৎপত্তি (ছবি ৩)।

এসক্লেরা বা অস্বচ্ছ আবরণ গোলকের ভিতরের নরম ও দরকারী জিনিসগুলি আঘাত হইতে রক্ষা করে। ইহা দেখিতে অনেকটা সাদা কিন্তু বাচ্চাদের চোখে মাঝে মাঝে ইহাতে হালকা নীলাভ রং দেখা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ইহা মধ্যমস্তরের জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে। এসক্লেরার (অস্বচ্ছ আবরণ) সামনের দিকের বর্ধিত স্বচ্ছ অংশের নামই কর্নিয়া (অচ্ছদপট)। এই স্তরের আবার অনেকগুলি উপস্তর আছে এবং ইহাতে কোন রক্তনালী নাই। কর্নিয়া একুয়াস হইতে তাহার খাদ্য পাইয়া থাকে। এই স্তরের কোন অসুখ দেখা দিলে ইহার স্বচ্ছতা নষ্ট হইতে পারে এবং অস্বচ্ছতার কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ইহার অসুখ-বিসুখ খুবই যন্ত্রণাদায়ক। কর্নিয়া ও এসক্লেরার সংযোগস্থলের নাম লিমবাস।



১। করনিয়া (অচ্ছদ পট)
২। এস্‌ক্লেরা (অচ্ছদ আবরণ)
৩। আইরিস
৪। পিউপিল (তারা)
ক্ষিপাতা (লিড)
৬। আখি পাতার লোম
৭। পাংটা
৮। প্লাইকা সেমিলুনারিস্‌
৯। ক্যারান্‌ কুল
১০ ভ্রু

ছবি—৩

মধ্যমস্তরের আবার তিনটি ভাগ আছে। সম্মুখের দিকে আইরিস বা কনিনিকা, মধ্যে সিলিয়ারী বডি ও পিছনে করয়্যাড ও কৃষ্ণ গোলক। রক্তনালী, স্নায়ু ও বাদামী রংএর রঙ্গীন কোষ সমন্বয়ে গঠিত করয়্যাড হইল একটি পাতলা স্তর। এই স্তরকে একত্রে

ইউভিয়াল ট্র্যাকট বা কৃষ্ণমণ্ডল বলা হয়। ইহা চোখের অভ্যন্তরের জিনিসগুলির জন্য খাদ্য পরিবহণ করে। সিলিয়ারী বডি আইরিস ও করয়্যাডের সংযোগ রক্ষা করে। ইহার আবার দুইটি অংশ আছে। একটি হইল রংবিহীন সিলিয়ারী মাংসপেশী, অপরটি রঙ্গীন সিলিয়ারী প্রসেস। সিলিয়ারী মাংসপেশী চোখের ফোকাসিং পাওয়ারের জন্য দায়ী (চক্ষু স্থিরিকরণের ক্ষমতা)। নিকট কাজ করিতে দৈনিক প্রায় একলক্ষ বার সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটে। সিলিয়ারী প্রসেস (সিলিয়ারী উপাঙ্গ) এ্যকুয়াস হিউমার নামক একপ্রকার তরল স্বচ্ছ পদার্থ তৈয়ার করে। ইহা চোখের স্বচ্ছ পদার্থগুলিকে খাদ্য পরিবহণ করে। সিলিয়ারী বডি ও আইরিস (কনিনিকা) হইতে নিঃসরিত দূষিত পদার্থ দূরীভূত করে। এ্যকুয়াস হিউমার কর্নিয়া, এসক্লেরা ও আইরিসের মিলনস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে শিরার মধ্যে চলিয়া যায়। চক্ষুগোলকের চাপ এই তরল পদার্থের উপর একান্ত নির্ভরশীল। যদি কোন কারণে এই তরল পদার্থের গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন চোখের ভিতরকার চাপ বাড়িয়া যায়। ইহাতে চোখ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আবার যদি অস্ত্রোপচারের সময় এই পদার্থ বাহির হইয়া যায়, ইহা আবার তাড়াতাড়ি তৈরী হইয়া যায়।

আইরিস (কনিনিকা) একটি সূক্ষ্ম রঙ্গীন পর্দার মত। কর্নিয়ার ভিতর দিয়া ইহার বাহিরের অংশ দেখা যায়। আইরিসের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কালো গোলাকার ছিদ্র আছে। ইহাকে পিউপিল (তারারন্ধ্র বা তারা) বলা হয়। অতিসূক্ষ্ম রক্তনালীর জাল ও স্পঞ্জের মত এক প্রকার পেশীর সমন্বয়ে আইরিস গঠিত। আইরিসের (কনিনিকা) এই সূক্ষ্ম গঠনপ্রণালী বাহির হইতে দেখা যায়। আইরিসের রং কাল বা নীল হয়। কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীতে আইরিসের (কনিনিকা) রং বিশেষ প্রকারের

হয়। আইরিসে দুই রকমের মাংসপেশী দেখা যায়। ইহার একটি বৃত্তাকার ও অপরটি ব্যাসার্ধের ধরনে লম্বালম্বিভাবে বিন্যস্ত। বৃত্তাকার পেশীর সংকোচনে পিউপিল ক্ষুদ্রতর হয়। আর লম্বালম্বি পেশীর সংকোচনে পিউপিল বৃহত্তর হয়। পিউপিলের প্রধান কাজ হইল আলোর রশ্মির নিয়ন্ত্রণ করা। তাই দেখা যায় অতি উজ্জ্বল আলোকে পিউপিলের আকার ছোট হয়, আর মৃদু আলোকে পিউপিলের আকার বড় হয়। অন্যান্য কারণেও পিউপিল ছোট হইতে পারে। যেমন নিকটে দৃষ্টি নিবদ্ধকালে অথবা কোন কোন ঔষধ ব্যবহার বা বিশেষ রোগে পিউপিল ছোট হইতে পারে। ঘুমন্ত অবস্থায়, উত্তেজিত অবস্থায়, চক্ষু যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে অথবা ঘাড় বা শরীরের অন্যান্য অংশে চিমটি কাটলে অথবা ভীত শঙ্কিত অবস্থায় পিউপিল বড় হয়। বিভিন্ন রকমের ঔষধ প্রয়োগের ফলে এবং চোখের বিশেষ অসুখে পিউপিল বড় হইতে পারে। আইরিসের পিছনের দিক গভীর বাদামী রং-এর কোষ দ্বারা গঠিত। অনেক সময় পিউপিলের কিনারা দিয়া এই কোষগুলিকে দেখা যায়। চোখের রং এই রঙ্গীন কোষগুলির উপর নির্ভরশীল। যাহাদের রঙ্গীন কোষগুলি বেশী তাহাদের চোখগুলি ততবেশী কালো। যাহাদের রঙ্গীন কোষ কম তাহাদের চোখ সাধারণতঃ পিঙ্গল বর্ণের হয়। অধিকাংশ লোকের দুই চোখের রং দেখিতে প্রায় একরকম। কিন্তু কোন কোন লোকের দুই চোখের রং-এর প্রভেদ থাকিতে পারে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের চোখ কালো হয়। রঙ্গীন কোষ চোখকে আলো হইতে রক্ষা করে।

আইরিসের (কনিনিকা) পিছনে ঝুলন্ত অবস্থায় চোখের স্বচ্ছ লেনস্ (পুতলী) অবস্থিত। সাসপেনসরি লিগামেন্টই (ঝুলন্ত লিগামেন্ট) এই ঝুলন্ত অবস্থার জন্য দায়ী। লেনসএর উপরের স্তর বিশেষ একটি খোলসবিশেষ। ইহার ভিতরে ফিতার মত

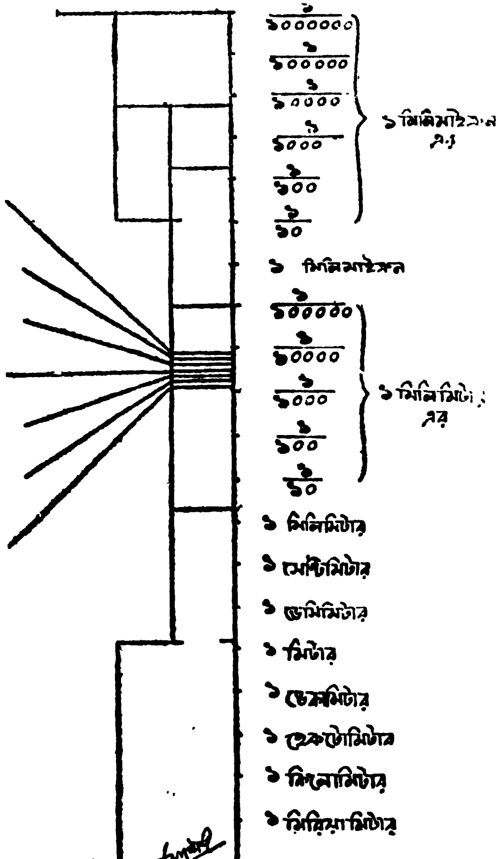
কোষগুলি পিঁয়াজের মত স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। বৃদ্ধকালে এই কোষগুলির স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়া গেলে লেনস্‌কে হালকা হলুদ রংএর দেখায়। কর্নিয়ার মত লেনসেও কোন রক্তনালী নাই। ইহার খাদ্য সাধারণতঃ এ্যকুয়াস হিউমার ও করয়্যাড হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে।

তৃতীয় অথবা ভিতরের স্তরের নাম রেটিনা (অক্ষিপট)। চোখের মধ্যে এই স্তরটি হইল স্পর্শকাতর। এই স্তরটির মাঝেই আলো-অনুভূতিপ্রবণ পদার্থ আছে। ইহা আলোক কম্পনকে স্নায়ু উত্তেজকে পরিণত করে। যাহা অক্ষিস্নায়ু দিয়া মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া আমাদিগকে দেখিতে সক্ষম করে। রেটিনাতে (অক্ষিপটে) দুইরকম আলোক অনুভূতিসম্পন্ন পদার্থ আছে। ইহার একটি হইল রড অন্যটি 'কোন' (Cone)। ইহাদের আকৃতির জন্য এই রকম নামকরণ হইয়াছে। রড কোষগুলি সাধাণতঃ রেটিনা সীমান্তে অর্থাৎ সিলিয়ারী বডির নিকটে বেশী রকমের দেখা যায়। আবার 'কোন' কোষগুলি বেশী রকমের দেখা যায় রেটিনার মধ্যস্থলে। এই স্থানটি দেখিতে হলুদ বর্ণের। ইহাকে ম্যাকুলা লুটিয়া বলা হয়। এই ম্যাকুলা লুটিয়ার মধ্যে আলপিনের মাথার মত একটি বিন্দু আছে। ইহার নাম ফবিয়া সেন্ট্রালিস্‌। মানব-রেটিনাতে ৬০ হইতে ৭০ লক্ষ কোণ এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ রড আছে। স্পর্শকাতর কোষগুলির সাথে এক রকম সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুর সংযোগ আছে। রডের বাহিরের অংশে এক রকম পদার্থ থাকে তাহাকে রডপ্‌সীন বলা হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা 'কোনের' মধ্যেও এই রকম দুইটি পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন। ইহারা উহাতে খুব অল্প পরিমাণেই আছে এবং উহা শুধু কমলা ও সবুজ আলোতে কাজ করে। রড ও 'কোন' ছাড়াও বিশেষ ধরনের স্নায়ুতন্তু ও কালো রঙ্গীন কোষ দ্বারা রেটিনার অন্যান্য স্তর তৈয়ার হইয়াছে। তাই দেখা

যায় সবচাইতে বাহিরের স্তর হইল রঙ্গীন কোষগুলি, তারপরে আসে রড্ ও 'কোনের' স্তরটি। সবচেয়ে ভিতরের স্তর স্নায়ুতন্তুর দ্বারা গঠিত। এই তন্তুগুলি একই দিকে ধাবিত হইয়া অপটিক্ ডিস্ক নামক একটি জায়গার মধ্য দিয়া চক্ষু হইতে বাহির হইয়া যায়। এই স্নায়ু তন্তুগুলির মিলিত নামই হইল অপটিক্ নার্ভ বা অক্ষিস্নায়ু। চোখের ভিতরে পরীক্ষা করিতে গেলেই অপটিক্ ডিস্কের দিকে নজর দেওয়া উচিত। এই থালার মত এলাকাটিতে রড্ এবং 'কোন' না থাকাতে ইহার উপর আলোর কোন প্রভাব নাই। এই কারণে ইহাকে অন্ধ এলাকা বা (Blind spot) বলা হয়। ইহা ছাড়া এই অপটিক্ ডিস্কের ভিতর দিয়াই রক্তনালী চোখের ভিতর ঢুকিয়া রেটিনার উপর ছড়াইয়া পড়ে।

রেটিনা ও মণির মধ্যের খালি জায়গাটুকু ভিট্রাস (vitrous) নামক একটা অর্ধঘন তরল পদার্থ দ্বারা ভর্তি থাকে এবং ইহা চক্ষু গোলকের আকার ঠিকমত রাখে। এই পদার্থ যদি না থাকে তবে চক্ষুগোলক খালি বেলুনের মত চুপসাইয়া যাইবে। ইহার মধ্যে কোন স্নায়ুতন্তু বা রক্তনালী নাই। সুতরাং এ্যকুয়াস্ হিউমার হইতে ইহা খাদ্য পাইয়া থাকে। ভিট্রাস একবার নষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় তৈরী হইতে পারে না এবং চিরতরের জন্য নষ্ট হইয়া যায়।

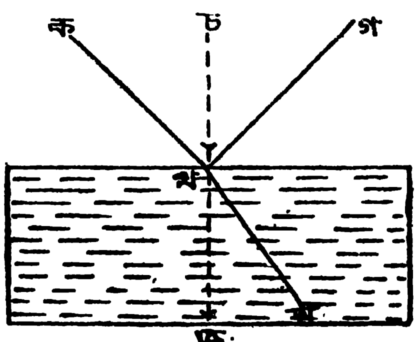
আলো বৈদ্যুতিক চুম্বকশক্তির বিচ্ছুরণের একটি অংশ। ইহা হইল শক্তির একটি রূপমাত্র। ইহা তরঙ্গের মত আন্দোলিত হইয়া



ছবি—৪

প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে চলে। সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সমান হয় না। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বহু মাইল হইতে আরম্ভ করিয়া এক মিলিমাইক্রনের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ পর্যন্ত হইয়া থাকে। এক মিলিমাইক্রন, এক ইঞ্চির আড়াইশত লক্ষভাগের এক-ভাগ। ইহাকে বৈজ্ঞানিক সঙ্কেতে মিউ (Mu) লিখা হয়। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য তিনশত আশি মিউ হইতে সাতশত আশি মিউ পর্যন্ত হইয়া থাকে। অবশ্য চোখের পুতুলি (lens) অপারেশন দ্বারা যাহাদের সরানো হইয়াছে তাহারা ইহা হইতে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো দেখিতে পারে। চিত্রে ইহার বিশেষ বিশেষ দিক দেখান হইয়াছে (ছবি—৪)।

আলো সরলপথে চলিয়া থাকে। ইহা যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম হইতে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে লম্বভাবে গমন করে, তখনও ইহা সরলপথে চলিয়া থাকে (ছবি—৫)। যেমন বায়ু হইতে পানিতে অথবা পানি

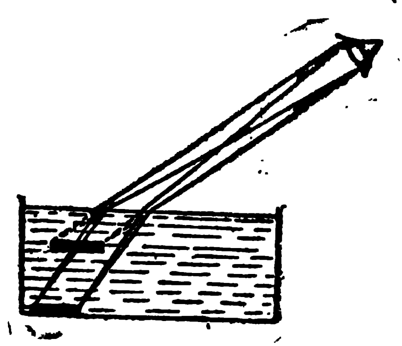


ছবি—৫

হইতে বায়ুতে। কিন্তু যখন ইহা এক স্বচ্ছ মাধ্যম হইতে অন্য ভিন্ন-তর ঘনত্ব বিশেষ মাধ্যমে তির্যকভাবে প্রবেশ করে তখন ইহার গতি-পথ পরিবর্তিত হইয়া যায়। আলোক-রশ্মিটি নূতন মাধ্যমে প্রবেশ করিয়া একটি নির্দিষ্ট কৌণিক গতিপথ অবলম্বন করে (ছবি ৫)।

আলোক-রশ্মির গতির এই পরিবর্তনকে আলোর প্রতিসরণ বলা হয়। রশ্মি ক, খ পানির উপর খ বিন্দুতে আসিয়া পড়িতেছে। প্রতি-ফলনের পর কিছু পরিমাণ আলো পানির ভিতর প্রবেশ করিয়া খ, ঘ রেখায় চলে, ও পানির ভিতর আলোক রশ্মিটি ক, খ রেখা বরাবর না চলিয়া পানির পৃষ্ঠে চ, জ লম্বের দিকে বাঁকিয়া গিয়া অপর একটি সরলরেখা খ, ঘ বরাবর চলে। যদি আলোক রশ্মিটি চ, জ রেখার উপর খ বিন্দুতে পতিত হইত তবে উহা সোজাসুজি চ, জ রেখা বরাবরই চলিত।

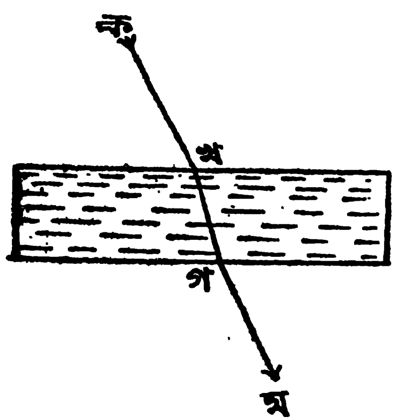
খ্রীস্টপূর্ব দুইশত সালে টলেমী ইহা সর্বপ্রথম একটি ছোট পরীক্ষার দ্বারা বুঝান। পরীক্ষাটি করিতে হইলে একটি পেয়ালা, একটি মুদ্রা ও সামান্য পানির দরকার। প্রথমে মুদ্রাটি পেয়ালার ভিতরে এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে ইহা দৃষ্টিগোচর না হয়। তৎপর ইহাতে আস্তে আস্তে পানি ঢালিতে হইবে। যতই পেয়ালাতে পানি বাড়িতে থাকিবে মুদ্রাটি ততই দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে। এইরূপ হওয়ার কারণ হইল আলো মুদ্রা হইতে পানির



ছবি— ৬

ভিতর দিয়া বাতাসে প্রবেশ করিয়া তৎপর আমাদের চোখে পতিত হয়। এই পানি হইতে বায়ুতে যাওয়ার সময় আলোক রশ্মিটি প্রতিফলিত হয় বলিয়াই মুদ্রাটি দৃষ্টিগোচর হইল (ছবি—৬)।

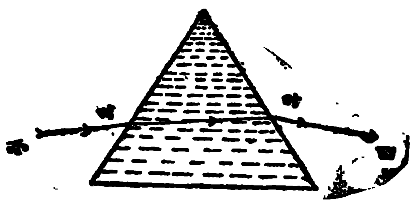
এই অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাপারের উপরেই আমাদের দৃষ্টিশক্তির ও জীবনের পারিপার্শ্বিকতার বহু ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা নির্ভর করে। আমরা দেখিয়াছি যে, কিভাবে আলোক-রশ্মি একটি তল হইতে অন্য ঘনত্বজনিত মাধ্যম অতিক্রম কালে তার গতি পরিবর্তন করে। এখন মনে করা যাক যেখানে একটি তল অন্য একটি তলের সমান্তরাল আছে যেমন একটি কাচের জানালা। জানালার কাচে যেখানে আলোক পতিত হয় ও যেখান হইতে নির্গত হয় ইহার ভিতরে তাহার গতি পরিবর্তন করিয়া থাকে। কিন্তু সর্বদাই আপতিত রশ্মি ও নির্গত রশ্মি সমান্তরাল হইয়া থাকে (ছবি—৭)। ক, খ আলোক রশ্মিটি কাচের ভিতর দিয়া যাওয়ার সময় একটু হেলিয়া খ, গ পথে গমন করে। আবার নির্গত 'গ' বিন্দুতে হেলিয়া গ, ঘ পথে গমন করিয়া থাকে। ক, খ ও গ, ঘ সর্বদাই সমান্তরাল থাকে। কেবল খ গ, ক, খ, ও গ, ঘ হইতে বাঁকিয়া থাকে বা হেলিয়া থাকে। এই



ছবি—৭

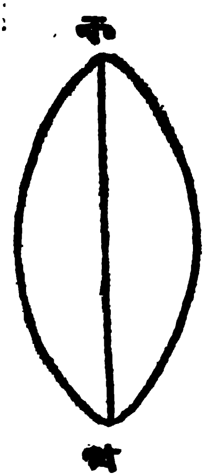
বার দুইটি তলদেশ যদি সমান্তরাল না হয় এবং পরস্পর বিশেষ একটি কোণের সৃষ্টি করে যেমন ত্রিকোণ কাচ বা প্রিজম, তখন

আলোক-রশ্মি আসল আপতিত রশ্মির সহিত সমান্তরাল হইয়া নির্গত হয় না। বরং দ্বিতীয় তল হইতে বেশী ঘনত্বের দিকে অর্থাৎ ত্রিকোণ কাচ বা প্রিজমের তলদেশের দিকে বাঁকিয়া যায় যেমন আট নম্বর ছবিতে দেখান হইয়াছে। দুইটি প্রিজমের তলদেশ এক-দিকে সংযোজিত করিয়া আলো প্রতিসরিত করিলে দেখা যাইবে যে আলোক-রশ্মি দুইটি পরস্পরের দিকে বাঁকিয়া একদিকে মিলিত হইবে। সেই মিলিতস্থানে প্রিজমের অপর দিকে ছোট একটা



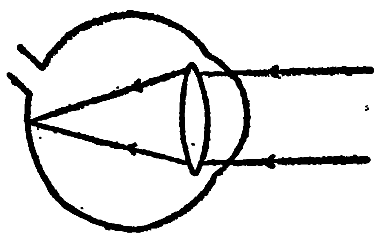
ছবি—৮

উল্টানো প্রতবিম্ব দেখা যাইবে। এইবার যদি দুইটি প্রিজমের উপরের স্তরটি গোলাকার করা হয় তাহা হইলে যেইরূপ লেন্‌স তৈরী হইবে তাহাকে উত্তল লেন্‌স বলা হয়। (ছবি—৯) ইহাতে উল্টানো প্রতিবিম্ব পাওয়া যাইবে। প্রতিবিম্বের দূরত্ব উত্তল লেন্স-এর বক্রতার উপর নির্ভর করে। বক্রতা যত বেশী হইবে প্রতিবিম্ব তত নিকটে হইবে। বক্রতা যত কম হইবে প্রতিবিম্ব তত দূরে হইবে। এই দূরত্বকে ফোকাল লেংগ্‌থ বলা হয় ছবি তোলার ক্যামেরাতে এই ফোকাল লেংগথের ফিল্ম বসাইতে হয়। মানব-চক্ষুকে এইরূপ একটি ক্যামেরার সাথে তুলনা করা যাইতে পারে। কর্নিয়া এবং লেন্‌স-এর বক্রতা আলোক-রশ্মিকে বাঁকাইয়া বাহির জগতের



ছবি—৯

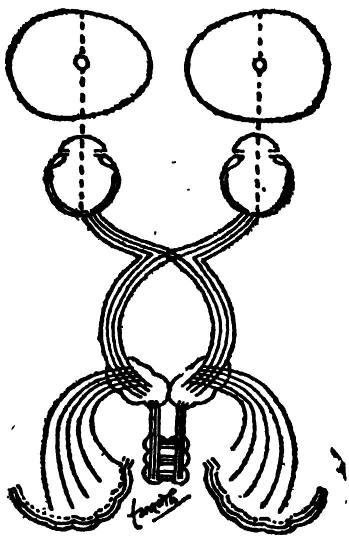
বস্তুগুলির প্রতিবিম্ব রেটিনার উপর ফেলে এবং ইহাতে ঐ বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার উপর তৈরী হয় (ছবি—১০)। এই প্রতিবিম্ব বেশীর ভাগই কর্নিয়ার দ্বারা সৃষ্টি হইয়া থাকে। লেন্‌স প্রায় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দূরত্বের পদার্থের প্রতিবিম্বকে রেটিনার উপর ফেলার জন্য নিজের বক্রতা পরিবর্তন করিয়া থাকে। সিলিয়ারী মাংসপেশীর দ্বারা এই পরিবর্তন ঘটে। ইহাকেই চোখের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান বা দৃষ্টির উপযোজন (Accommodation of vision) বলা হয়। এই পরিবর্তনের দ্বারাই বিভিন্ন দূরত্বের পদার্থের প্রতিবিম্ব রেটিনা বা অক্ষিপটের উপর তৈরী হয়। রেটিনা বা অক্ষিপটের উপরিভাগের আলোকে প্রতিক্রিয়াশীল রড্ ও 'কোন' দ্বারা তৈরী এই স্তরেই আলোক শক্তিকে একটি স্নায়বিক অনুভূতি বা স্নায়ু



ছবি—১০

উত্তেজক শক্তিতে পরিণত করে। ইবনে রুশদ্‌ই সর্বপ্রথম বর্ণনা দেন যে অক্ষিপট বা রেটিনা প্রতিবিম্ব গ্রহণকারী আলো প্রতিক্রিয়াশীল স্তর। এই পরিবর্তনের সময় কতকগুলি রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। রডের ভিতর যে রডপসিন থাকে, আলোক-রশ্মি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। অন্ধকারে ইহা পুনঃ তৈরী হয়। এই পুনঃ গঠনের জন্য ভিটামিন 'এ' দরকার হয়। দুধ ও সবুজ শাক-সব্জিতে, কড্‌লিভার অয়েলে ও শার্ক লিভার অয়েলে ভিটামিন 'এ' থাকে। উজ্জ্বল আলোকে 'কোন'গুলি উত্তেজিত হয় এবং মৃদু

আলোকে রডগুলি উত্তেজিত হয়। রড স্তরেই নড়াচড়ার দৃষ্টি অনু-ভূত করিতে পারে। ইহা পদার্থের রং বা আকৃতির তফাৎ অনুধাবন করিতে অক্ষম। রড এবং 'কোন' দিয়া এই স্নায়বিক অনুভূতি গ্যাং-লিয়নিক স্তর ও মলিকুলার স্তর দিয়া স্নায়বিক স্তরে পৌঁছায়। সেই-খান হইতে অক্ষিস্নায়ু দিয়া (Optic nerve) অপটিক ক্যায়েজমা হইয়া বিভিন্ন স্তর ও অঙ্গ হইয়া মস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত

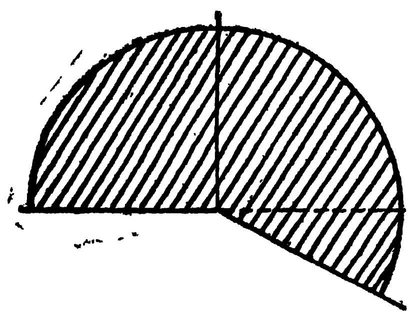


ছবি – ১১

দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে পৌঁছায়। মস্তিষ্ক এই অনুভূতিকে পূর্ববর্তী সংরক্ষিত অনুভূতির এবং কর্ণ, ত্বক ইত্যাদি দ্বারা প্রবাহিত অন্যান্য অনুভূতির সহিত মিলাইয়া এই প্রতিবিম্বের ব্যাখ্যা দান করে। তখনই আমরা দৃষ্ট বস্তুবিশেষের সঠিক পরিচয়, আকৃতি. বর্ণ বৈচিত্র্যতা, গভীরতা এবং ঐ বস্তুবিশেষের বিভিন্ন অংশের রূপ ও আকৃতি বুঝিতে সক্ষম হই (ছবি—১১)।

দৃষ্টিশক্তির পরিধি

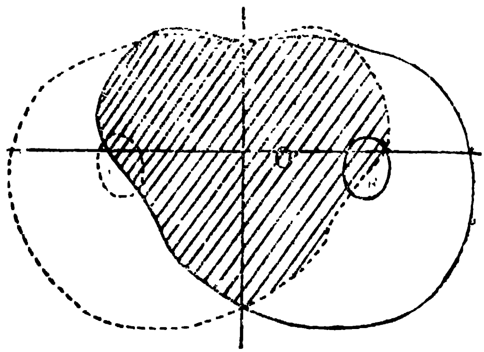
চোখের অবস্থানের উপর দৃষ্টির ক্ষেত্রের বিস্তার নির্ভর করে। আবার চক্ষু নড়াচড়া করার ক্ষমতাও ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার প্রাণিজগতে চক্ষুকোটর মাথার খুলির পার্শ্ব হইতে সম্মুখভাগের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। বেশীর ভাগ পাখীর চক্ষু মস্তকখুলির পার্শ্বে অবস্থিত, যেমন পায়রা। আবার অনেক চতুষ্পদ জন্তুর চক্ষুও পার্শ্বে অবস্থিত। যেমন, ঘোড়া। এই পার্শ্বে অবস্থানেরও তারতম্য রহিয়াছে, কোনটা পার্শ্বে হইলেও অনেকটা সম্মুখভাগে নিকটবর্তী আবার কোনটা অনেক দুরবর্তী। পার্শ্বে অবস্থিত চক্ষু পার্শ্বের দিকে অনেক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পর্যন্ত



ছবি—১২

দেখিতে পায়। এইরূপ চক্ষুর দৃষ্ট সাধারণতঃ ২০৮° পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, ফলে পার্শ্বের পরিধি বেশী হয় যেমন (ছবি—১২)। মানব-চক্ষু যদিও মস্তকখুলির সম্মুখভাগে অবস্থিত কিন্তু ইহার দৃষ্টিশক্তির বিস্তার চতুর্দিকে সমান হয় না। নাক এবং কপাল দুইদিকেই ইহাকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে। বাহিরের দিকে ৯০° ডিগ্রীর বেশী হয়, ১০৪° ডিগ্রী পর্যন্ত হইয়া থাকে, উপর হইতে নীচের দিকে একটু বেশী থাকে আবার নাকের দিকে বেশ

সঙ্কুচিত হয়। ভিতরের দিকে বা নাকের দিকে ৬০° ডিগ্রী, উপরে ৫৫° ডিগ্রী হইতে ৬০° ডিগ্রী, নীচে ৭৫° ডিগ্রী, বাহিরের দিকে ১000° ডিগ্রী হয়। মাঝখানের কিছুটা অংশ দুই চক্ষুর দ্বারাই দৃষ্ট হয় (ছবি—১৩)। এই ক্ষেত্রের ভিতরে একটি স্থান আছে



ছবি—১৩

যেখানে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না তাহাকে 'অন্ধবিন্দু' বলা হয়। এই বিন্দুর কেন্দ্র ক্ষেত্রের স্থিতি বিন্দু হইতে বাহিরের দিকে ১২° ডিগ্রী হইতে ১৫° ডিগ্রীর দিকে থাকে। ইহার বিস্তার খাড়াভাবে ৭·৫° ডিগ্রী ও আনুভূমিক ৫·৫° ডিগ্রী হইয়া থাকে। অক্ষিপটের যে-স্থান দিয়া অক্ষিস্নায়ু নির্গত হয়, সেই থালার মত অংশটি "অন্ধবিন্দুর" সৃষ্টি করে।

বর্ণদৃষ্টি

"কেমন করিয়া বিভিন্ন বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে" ইহা আদিকাল হইতেই মানব-মনকে আলোড়ন করিয়া আসিতেছে। কেমন করিয়া দেখা যায় ইহা বুঝিতেই মানব জাতির বহুদিন সময় লাগিয়াছে। প্রথম ধারণা ছিল চোখ হইতে কোন বস্তুর উপর আলো পতিত হইলে সেই বস্তু দৃষ্ট হয়। মাত্র সেইদিন মুসলিম আলোক-বৈজ্ঞানিক ও গণিত শাস্ত্রবিদ হাসান ইবনে আল্ হাইশাম

(আল্ হাজেন) (৯৬৫ খৃঃ—১০৩৮/৩৯ খৃঃ) প্রথম বুঝাইলেন যে বস্তু হইতে আলো চোখের উপর পতিত হইলে সেই বস্তুর একটি প্রতিবিম্ব চোখে সৃষ্টি হয় এবং তখনই সেই বস্তু দৃষ্ট হয়। তাঁহার "কেতাবুল মানাজির" আলোক বিদ্যার একখানা বিখ্যাত কেতাব। তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ও ইহার বিশেষ নিয়মাবলী লইয়া যথেষ্ট গবেষণা করেন। দৃষ্টি-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক লইয়া তিনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন ও বহু সত্য উদঘাটন করিয়াছেন।

দৃষ্ট আলোক-রশ্মির মধ্যে সবচাইতে লম্বা তরঙ্গবিশিষ্ট যে আলো মানব-চক্ষু বুঝিতে সক্ষম তাহা লাল রং-এর দৃষ্টি দান করে আর সব চাইতে ছোট তরঙ্গবিশিষ্ট যে আলো মানব-চক্ষু দেখিতে সক্ষম তাহা বেগুনী রং সৃষ্টি করে। মধ্যবর্তী তরঙ্গগুলি অন্যান্য রং সৃষ্টি করে। লাল রংএর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে ৬০০ Mu হইতে ৭০০ Mu হইয়া থাকে। আর বেগুনী রং ৩৮০ Mu হইতে ৪৩০ Mu হইয়া থাকে। অন্তর্বর্তী দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলো যথাক্রমে নীল, আসমানী, হলুদ, কমলা সবুজ রং-এর দৃষ্টি দান করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গবিশিষ্ট আলো চোখের ভিতরকার অঙ্গগুলির উপর এমন কি বিশেষ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে যাহার দরুন মস্তিষ্ক বিভিন্ন রংএর তারতম্য বুঝিতে সক্ষম হয়? ইহা সঠিকভাবে এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার হয় নাই। তবে নানা দৃষ্টি-বৈজ্ঞানিক ও চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের নানা মত রহিয়াছে। কাহারো মতে যেহেতু একটি বিশেষ আলোর তীব্রতা ও উজ্জ্বলতা না হইলে কোন রংই দৃষ্ট হয় না। সেইহেতু কেবলমাত্র অক্ষিপটের 'কোন'গুলি বিভিন্ন বর্ণ দেখিতে সক্ষম বলিয়া মনে করেন। তাহাদের ধারণা বিভিন্ন তরঙ্গবিশিষ্ট আলো বিভিন্ন 'কোন'কে উত্তে-

জিত করে. এবং সেইহেতুই বিভিন্ন রং দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কাহারো মতে বিভিন্ন তরঙ্গমালা অক্ষিপটে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিভিন্নতার জন্যই অক্ষিস্নায়ুর বিশেষ বিশেষ অংশগুলি উত্তেজিত হইয়া রংএর বিভিন্নতা সৃষ্টি করে।

বার্ধক্যে চক্ষু

বার্ধক্যে চক্ষুতন্তু বা চক্ষুপেশীর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল সংযোজন বা যোগাযোগ পেশীর মাত্রা বেশী হওয়া, আর্দ্রতা নষ্ট হওয়া, চর্বিপেশীর অনুপ্রবেশ হওয়া ও হায়ালিন পেশী পরিবর্তন। এই পরিবর্তনগুলি কেবলমাত্র বয়সের জন্যই চোখে বিভিন্ন আকারের তারতম্য ঘটায়।

আঁখি পাতা (নয়নপল্লব)

ইহার বৃত্তাকার মাংসপেশীর স্থৈর্যশক্তি কমিয়া গিয়া উপর পাতার পতনই হইল বৃদ্ধ বয়সে চক্ষুপাতার সবচাইতে বড় পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনই চোখের নিম্ন পাংটাকে (আঁখিপাতার ছিদ্র), আঁখিগোলক হইতে দূরে সরাইয়া দেয়; ফলে চোখে জলস্ফীতি ঘটায় এবং ইহা চোখের চতুষ্পার্শ্বের চামড়াকে সর্বদা ভিজা রাখে, এমন কি সময় সময় চামড়ায় পচন ধরায়। অন্যান্য পরিবর্তনের ভিতর চোখের চামড়া কুঁচকাইয়া যাওয়া বা দুই পাতা লাগিয়া থাকা। ঝোলানো আঁখিপাতার কুঁচকানো চামড়া এবং প্রায়ই পানি ঝরা, এইগুলি বার্ধক্যের বিশেষ চিহ্ন।

সংযোজন বা জোড়নপেশী

ইহাকে 'নেত্র-বর্ত কলাও" বলা হয়। বৃদ্ধ বয়সে সংযোজন বা জোড়নপেশীর শিরা উপশিরাগুলিতে চর্বি জমিয়া মোটা এবং ভঙ্গুর হইয়া পড়ে কিন্তু জোড়নপেশী নিজে বেশী পাতলা হইয়া পড়ে। চোখের মাঝের দিকে নাসিকা-সেতুর পাশে এক রকমের আঁঠালো

হলুদ রংএর পদার্থ জমা হয়। ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় পিন-গোয়েকলা—ইহা একটি ক্ষয় প্রণালী।

অক্ষিগোলকের অস্বচ্ছ আবরণ

ইহা খুব পুরু। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ইহা আসল রং বদলাইয়া ঈষৎ হলুদ বর্ণের ও পুরু হইয়া পড়ে। রং বদল শুধু চর্বি জমার ফলেই হইয়া থাকে।

অচ্ছদপট বা অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ আবরণ

বয়সের সাথে সাথে অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ আবরণ দিগন্ত রেখার চাইতে উল্লম্ব বা উধ্ব´-অধঃ রেখা বেশী চ্যাপ্‌টা হইয়া পড়ে। বেশী বয়সে অচ্ছদপট সামান্য ঘোলাটে এবং উজ্জ্বলতাহীন হইয়া পড়ে। এই অস্বচ্ছতার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হইল "আর্কাস সিনা-লিস"। এই সাদা বন্ধনীই অচ্ছদপটের চারিদিক বৃত্তাকারে অতিক্রম করে। প্রথমে ইহা অক্ষিগোলকের উপরে ও নীচে দেখা দেয়, তাহার পর অবশিষ্ট অংশকে ঘিরিয়া ফেলে এবং একটি গোলাকার সাদা বন্ধনী বা আংটির আকার ধারণ করে। কিন্তু ইহা সবসময় স্বাস্থ্যবান অচ্ছদপটের সীমা নির্ধারণ করিয়া চলে। সাধারণতঃ অচ্ছদপটের বিভিন্ন স্তরের ভিতরে চর্বিতন্তুর অনুপ্রবেশের ফলেই ইহার সৃষ্টি হয়। ডেসিমেট্‌স মেমব্রেনের পিছন দিকে কতকগুলি গোলাকার আঁচুলির মত জায়গা দেখা যায়, এইগুলিকে "হেসেল হেনলী বডি" বলা হয়। বয়সের সাথে সাথে ইহা আয়তনে বাড়িতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে অচ্ছদপটের পিছনে কতকগুলি রঙ্গীন দানা জমে। প্রায় ৫০ বৎসর উর্ধ্বের বৃদ্ধদের চোখের দিগন্তরেখা বরাবর (মধ্য তৃতীয়াংশ ও নিম্নভাগে) কতকগুলি রঙ্গীন দানা জমে এইগুলিকে বলা হয় "হার্ডসন ও স্টেইলিস্‌" রেখা। তীব্র আলো দিয়া দেখিলে অচ্ছদপটের বিভিন্ন স্তরের ভিতরে ধূলিকণার মত অস্বচ্ছ কতকগুলি কণা দেখা যায়, যাহাকে বলা হয় "করনিয়া ফেরিনেটা"।

কনিনিকা ও তারারন্ধ্র বা মণি

বৃদ্ধ বয়সে কনিনিকা কতকগুলি জায়গায় স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। বৃদ্ধ বয়সে কনিনিকা প্রায়ই ছোট আকার ধারণ করে এবং অধিক শক্ত ও আঁশাল হইয়া পড়ে।

সিলিয়ারী প্রণালী

বয়সের সাথে সাথে ইহা বড় আকারে দেখা দেয়। বিশেষ ধরনের হায়ালিন পরিবর্তনের সাথে সাথে কনিনিকাকে সামনে আগাইয়া দেয় এবং ইহা সামনের দিকে কনিনিকাকে সরু করিয়া ফেলে। এই পরিবর্তনের ফলে "গ্লোকোমা" নামক এক প্রকার রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। চোখের অন্তঃচাপ বৃদ্ধি হওয়াকে "গ্লোকোমা" বলা হয়।

সিলিয়ারী মাংসপেশী

মাংসপেশীর আঁশগুলি সরু হইয়া পড়ে এবং যোগাযোগ তন্তুগুলি মাত্রায় বেশী হইতে থাকে। যাহার ফলে নিকট দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে. সাধারণ কথায় আমরা যাহাকে "চালসে লাগা" বলি। প্রতিকূল আবহাওয়া ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আমাদের দেশে সাধারণতঃ ৩৫ বৎসর বয়সেই নিকট দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে।

কনিনিকা ও অচ্ছদপটের মধ্যবর্তী কোণ

এই কোণে এক প্রকার দানা জমা হয় এবং বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে বৃদ্ধ বয়সে অন্তঃচক্ষু চাপ শুধু এইজন্যেই বৃদ্ধি পায়। কারণ 'ট্রেবিকুলার পেশীর" অন্তর্বর্তী ছিদ্রপথগুলি এই দানার দ্বারা বন্ধ হয়। 'ট্রেবিকুলার পেশীগুলি" তখন পুরু ও ক্ষয়প্রবণ হইয়া পড়ে।

পুতলি (Lens)

বৃদ্ধ বয়সে পুতলির অন্তঃকোষ এবং কোষাবরণ ও আঁশগুলি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। পুতলিতে বেশী মাত্রায় যে পানি থাকে তাহা

ছাড়িয়া দিয়া অন্তঃকোষটি ক্ষুদ্র ও চাপা হইয়া পড়ে। কোষাবরণ-এর শোষণক্ষমতা কমিয়া যায়। পুতলি আবরণের শোষণক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় ইহার বিপাক প্রণালীর অধিক মাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। ইহার ফলে অদ্রবণীয় পদার্থ, যেমন, আমিষ, লিপিড চূন জাতীয় পদার্থ এইগুলির মাত্রা বাড়ে এবং "গ্লুটাথিওন" ও ভিটা-মিন সি'-এর পরিমাণ কমিযা যায়। এহেন রাসায়নিক অসমতার ফলেই স্বচ্ছ পুতলি অস্বচ্ছতার দিকে আগাইয়া আলোক বিচ্ছুরণ ক্ষমতার ব্যাঘাতের একটি কারণ হইল পুতলির এই অস্বচ্ছতা। এই অন্তঃ আলোক বিচ্ছুণের তারতম্যের জন্যই অল্প বয়স্কদের পুতলির উজ্জ্বলতা ও বৃদ্ধ বয়সের পুতলির অনুজ্জ্বলতা নির্ভর করে। সিলিয়ারী মাংসপেশীর দুর্বলতা ও পুতলির আয়তনের পরিবর্তনই হইল চালসে ধরার কারণ। অনেকের ধারণা যে আয়ু সরাসরিভাবে চালসে ধরার গতির পরিবর্তনের আনুপাতিক। তাই বযোবৃদ্ধি এবং চালসে লাগা পরস্পর সমান্তরালভাবে চলে।

এই বয়োবৃদ্ধির জন্য চোখে ছানি পড়িতে পারে। অন্তঃকোষে ছানি ধরায় দৃষ্টিশক্তির নানারকম পরিবর্তন ঘটে। এতদিন যে ব্যক্তি চশমা লাগাইয়া নিকট-কাজ করিত সে এখন হইয়া পড়িল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; যেহেতু চালসে ধরার দূরদৃষ্টি ছানি পড়ার নিকট দৃষ্টির জন্য বাতিল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় আলোর চারিদিক নীল ও লাল আলোকচ্ছটা দেখা যায়। উপরোল্লিখিত পরিবর্তনের ফল গ্লোকোমাকে উপরিবর্ণিত উপসর্গ হইতে পৃথক করিতে হইলে 'স্টেনিও স্কোপিক' আলোর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলে গোলাকার আলোক-রশ্মিগুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনে হইবে ও সরল রেখাগুলি ম্রিয়মাণ দেখা যাইবে। পুতলির কিছু অংশ মোটা হইয়া পড়ে। এইগুলি সম্পূর্ণ বৃদ্ধ বয়সের পরিবর্তন। ভিট্রাস বা পশ্চাদ কক্ষের আঠালো পানি : বৃদ্ধবয়সে ভিট্রাসের ভিতর অস্বচ্ছ কতকগুলি

ভাসমান বস্তু দেখা যাওয়া অবান্তর কিছু নয়। ইহা গলিয়া যাওয়া ভিট্রাসের একটা অস্বচ্ছ পরিবর্তন।

ফাণ্ডাস

(ক) **রক্তবহা নালী**: শিরা-উপশিরার আবরণের বিভিন্ন স্তরে চর্বি জমিয়া ইহার ভিতরের নলী সরু হইয়া যায়। ইহার গতিপথ আঁকাবাঁকা হইয়া যায় এবং আসল রং বদলাইয়া ফ্যাকাশে হইয়া পড়ে। এই পরিবর্তনের কারণ হইল আবরণের বিভিন্ন স্তরের, যেমন, মধ্যমা ও অন্তঃ মাংসপেশীর ভিতর চর্বি ও সংযোজক পেশীর অনুপ্রবেশ। স্থিতিস্থাপক ঝিল্লীর অপসারণ ঘটে। শিরাতেও একই ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। অক্ষিপট ও কৃষ্ণমণ্ডলীর শিরা-উপশিরাগুলিও একই রকম পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। শিরা-উপশিরার আলোক প্রতিফলন শক্তি অনেক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণমণ্ডলে রঙ্গিন এপিথিলিয়ামের পরিবর্তন হইয়া 'কলয়েড' বডির সৃষ্টি করে। অক্ষিপটের উপর, বিশেষ করিয়া ইহার মধ্যভাগে এই ছোট ছোট হলুদ রং-এর গোলাকার বিন্দুগুলি ছড়াইয়া থাকে। বৃদ্ধদের অক্ষিপটে রঙ্গিন দানাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া থাকে। বৃদ্ধদের ফাণ্ডাস যুবকদের মত অতটা উজ্জ্বল দেখায় না এবং তাহাদের তুলনায় ইহা পাতলা হইয়া যায়। 'ম্যাকুলা' বা দৃষ্টিবিন্দুর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দানা দানা রঙ্গিন কলয়েড বডি ইহার উপরে দেখা যায়।

(খ) **ডিস্ক (থালা)**: বয়সের সাথে সাথে ডিস্ক ফ্যাকাশে বা পাংশে হইয়া যায় এবং আকারেও ছোট হইয়া যায়। ইহার শিরা-উপশিরার ক্ষয়ক্ষতির জন্যই ফ্যাকাশে আকার ধারণ করে। কতকগুলি রোগজনিত অস্বাভাবিক পরিবর্তন রহিয়াছে যাহা এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন ও বার্ধক্যজনিত পরিবর্তনের সাথে দ্বিধার সৃষ্টি করিতে পারে। এই রোগজনিত অস্বাভাবিক পরিবর্তন হইল কৃষ্ণমণ্ডলীর

ক্ষয় (কারোইডাল ইসক্লোরোসিস), রক্তচাপ বৃদ্ধিসহ অসম্প্রসারণশীল শিরা (আরটারিও ইসক্লোরোসিস উইথ হাইপারটেনশন) অস্বাভাবিক কলয়েড বডিস্ এবং মায়োপিক ডিজেনারেশন। সাধারণভাবে বিবেচনা করিলে অস্বাভাবিক রোগজনিত অবস্থাগুলি অতিরঞ্জিত এবং বড় বাড়ানো। কিন্তু বয়সের জন্য যে পরিবর্তন তাহা খুব বিপজ্জনক নয়।

(গ) **কৃষ্ণমণ্ডলীর ক্ষয়** (কোরোয়ডাল ইসক্লোরোসিস): এই অবস্থায় সবচাইতে বড় লক্ষণ হইল "ওপথলমোসকোপ" দ্বারা সাদা ফলক দৃষ্ট হওয়া। এই আলোক-ফলকগুলি কৃষ্ণমণ্ডলীর ক্ষয়িত বা অধঃপতিত অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। ইহার সাথে অক্ষিপটের ক্ষয়ক্ষতির কোন সম্বন্ধ নাই।

(ঘ) **রক্তচাপে চোখের শিরা-উপশিরার পরিবর্তন** (চেঞ্জেস অব দি ফাণ্ডাস ভেসেলস ইন হাইপারটেনশন): এই অবস্থায় রক্ত শিরা-উপশিরাগুলি বেশ আঁকাবাঁকা ও গতিপথচ্যুত হইয়া পড়ে। আলোক প্রতিফলন ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। ভিতরের নালী সরু হইয়া পড়ে। যাত্রাপথ পরিবর্তিত এবং প্রবাহিত পথে বাধা পরিলক্ষিত হয়। ধমনীগুলি (ভেইন) বেশীরকম অনিয়মিত হইয়া পড়ে। এই চেহারা আরও ধরা পড়ে যখন ইহার সাথে এক্স্যুডেট, রক্ত ও শোথ (ইডেমা) যোগ দেয়।

(ঙ) **প্যাথলজিকাল কলয়েড বডি**: এইগুলি বড় এবং উল্লেখযোগ্য আকার ধারণ করে। ইহা সাধারণতঃ যে চোখে ক্ষয় শুরু হইয়াছে, চাকা (গ্রোথ) দেখা দিয়াছে সেইখানেই দেখা যায়। ম্যাকুলার ক্ষয়ক্ষতিজনিত প্রথম পর্যায়ে ইহা ধরা পড়ে।

(চ) **মাইয়োপিক ডিজেনারেশন**: কৃষ্ণমণ্ডলীর শিরা-উপশিরাগুলির ভিতর দিয়া অক্ষিগোলকের সাদা, স্বচ্ছ আবরণ (ইসক্লিরা) দেখা

যায় রক্তনালীগুলি এই বয়সে এইখানে যতটা দেখা যায় অন্য বয়সে তাহা দেখা যায় না।

(ছ) **কর্মক্ষমতা :** আকারের পরিবর্তন ছাড়াও বয়সে চোখের কতকগুলি কাজের পরিবর্তন বা অক্ষমতা দেখা দেয়। দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়। ইহাকে আমরা সাধারণতঃ চালসে লাগা বলি। আকারের পরিবর্তনের জন্য যাহা যাহা ঘটে তাহা হইল চোখের তারা (পিউপিল) ছোট হওয়া, স্বচ্ছ মধ্যমা (ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়া) গুলি কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছতা প্রাপ্তি, যাহার জন্য বৃদ্ধদের অনেক বেশী শক্তির আলো ব্যবহার করিতে হয়। অক্ষিপটের চারিদিকের পরিবর্তনের ফলে দৃষ্টিশক্তির পরিধিও (ফিল্ড অব ভিশন) কমিয়া যায়।

টেলিভিশন দর্শকদের প্রতি

(অবশ্যপালনীয় নিয়মাবলী)

বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিভিশন সার্ভিস বেশ জনপ্রিয়। ইহার আওতাভুক্ত অঞ্চলও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দর্শকদের সংখ্যাও যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ইহার দর্শক। আমরা মনে করি সকলেই দৃষ্টিশক্তির উপর ইহার ক্ষতিকারক প্রভাব হইতে বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যথোপযুক্ত জ্ঞান না থাকায় পুরাপুরি নিয়মমত ইহা দর্শন করিতে পারে না। এখানে আমরা টেলিভিশন দর্শকদের পালনার্থে কতকগুলি সংকেত দিতেছি।

(ক) যে কামরায় টেলিভিশন দেখা হয় তাহার আলোর ব্যবস্থা

(১) অত্যধিক আলোর বৈষম্য চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক।

(২) অতি উজ্জ্বল বস্তুর পাশে অত্যধিক অন্ধকার বস্তু দর্শনে চক্ষুর উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইহার প্রভাব হইতে বাঁচিতে হইলে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে টি. ভি. দর্শন করা উচিত নয়।

(৩) টি. ভি.র প্রতিফলকের আলোর আনুপাতিক আরামদায়ক মৃদু আলো সর্বদা কামরায় থাকা উচিত। যেহেতু অন্ধকার ঘরে অতি উজ্জ্বল টি. ভি.র প্রতিফলক সহজেই চোখের ক্লান্তি আনে।

(খ) কামরায় আলোর অবস্থান

(১) কখনও আলোর এমন অবস্থান করিতে নাই যাহাতে আলো সোজাসুজি টেলিভিশনের প্রতিফলকে পড়ে অথবা দর্শকের চক্ষুর উপরে সোজাসুজি পড়ে।

(২) আলোর অবস্থান দর্শকের মাথার উপর ও সামান্য পিছনের দিকে হইলেই ভাল হয়।

(গ) টি. ভি. সেট চালানো

(১) টি. ভি. সেট যত্নসহকারে পরিচালনা করিতে হইবে।

(২) পরিপুর্ণ তাপের সৃষ্টি হইলে ইহাকে পুনরায় নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

(৩) অস্থির এবং বিকৃত ছবি চক্ষুর উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে। এমন কি ইহা অনেক সময় মৃগী রোগের আক্রমণের সহায়ও হইয়া থাকে।

(৪) সকলেরই জানা আছে যে দর্শকেরা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, মেহমান লইয়া অনেক সময় টি. ভি. দর্শনে কোন বাড়ীতে গিয়া থাকেন। বাড়ীর মালিক হয়তো বা অনেক সময় জানেন না যে দর্শকের ভিতরে কাহারও এমন রোগ আছে কিনা। তাই এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

(ঘ) দর্শনের সময় কাল

(১) একদৃষ্টে বহুক্ষণ টি. ভি. দর্শন চক্ষুর উপরে চাপের সৃষ্টি করে। সুতরাং ইহা পরিহার করাই উচিত।

(২) মাঝে মাঝে দর্শকদের কামরার এদিক সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত।

(ঙ) দর্শনের নিয়ম

(১) কাহারো পক্ষে টেলিভিশনের পর্দার ছবিগুলি অতিরিক্ত পুঙ্খাপুঙ্খরূপে দেখার চেষ্টা করা উচিত নয়। ইহা চোখের জন্য অত্যন্ত ক্লান্তিদায়ক।

(চ) বসার ব্যবস্থা

(১) দর্শকদের টেলিভিশনের পর্দা হইতে ৬´ হইতে ১০´ ফুট দুরে বসা উচিত।

(২) মনে রাখা উচিত দর্শকদের বসিতে হইবে এবং বেশ আরামেই বসিতে হইবে, কখনও শায়িত বা অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকা উচিত নয়।

(ছ) দর্শকদের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে টেলিভিশন সেটের অবস্থান

টেলিভিশন সেটকে এমন অবস্থায় রাখিতে হইবে যে ইহার ছবিগুলি দর্শকদের চোখের একই সমতলরেখায় থাকে অথবা চোখের উচ্চতার চাইতে সামান্য নীচে, কখনও দর্শকদের চোখের সমতল হইতে টেলিভিশনের ছবির উচ্চতা যেন বেশী না হয়।

চোখে আঘাত ও কৃষকের চোখ

চোখ অত্যন্ত নাজুক অঙ্গ। সামান্য আঘাতেই ইহার যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। আঘাতকারী বস্তুগুলি হয়তো কোন দৈহিক আঘাত হানিতে পারে অথবা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। দৈহিক আঘাতের ভিতরে বালি, পাথর, কোন বস্তু বা যন্ত্র দ্বারা চোখে আঘাত, এক্সরে বা রঞ্জনরশ্মি, আলট্রাভায়োলেট রে ইত্যাদি। রাসায়নিক পদার্থের ভিতরে সর্বরকমের এ্যাসিড বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ। আবার কোন কোনটা দৈহিক ও রাসায়নিক দুই রকমেরই প্রক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে। যেমন, চুন, অনেক সামান্য আঘাতেরও ক্ষতিকর প্রভাব দৃষ্টির উপর বহুদিন স্থায়ী থাকিতে পারে।

চোখে আঘাতজনিত কারণের মধ্যে কৃষিকার্যজনিত আঘাতই সবচাইতে বেশী। চোখের পাতা, ঝিল্লি, অচ্ছদপট (কর্নিয়া) ও সম্পূর্ণ চোখেই আখের পাতা ও গরু মহিষের শিং দ্বারা আঘাত লাগিয়া থাকে বা জখম হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে এইসব আঘাতে বাহির হইতে বেশী ক্ষতি না হইলেও ভিতরে ভিতরে অনেক ক্ষতি করে। এইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রদাহের সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত অনেকেই চিকিৎসককে দেখানো প্রয়োজন মনে করেন না।

পরের পৃষ্ঠায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১৯৬৬ হইতে ১৯৬৮ পর্যন্ত চোখে আঘাতজনিত অবস্থার হিসাব দেখানো হইল।

মোট সংখ্যা ১৯৬৬ হইতে ১৯৬৮ পর্যন্ত	আঘাতের কারণ	রোগীর সংখ্যা	শতকরা
৪০৯০	(১) পেশাগত (ক) কৃষিকাজ-জনিত (খ) শিল্পকাজ-জনিত (গ) কারখানায় কার্যরত	২২৫০ বেশীর ভাগই	৫৫
	(২) উৎসব সংক্রান্ত (ক) সামাজিক ও বিবাহ ইত্যাদিতে (খ) ধর্মীয়, যেমন, হোলী খেলা	১২২৭	৩০
	(৩) অন্যান্য— (ক) পোকা (খ) হলিগানিজম (হৈ হুল্লোড়) (গ) প্রসাধন দ্রব্য যেমন কাজল, সুরমা সিঁদুর আইব্র বা ভুরু পেন্সিল, দৈবক্রমে চোখে আপতিত ফেস পাউডার দাগ, নিশ্চিহ্ন করার লোসন। (ঘ) সড়ক দুর্ঘটনা।	৬১৩	১৫

চোখের সাধারণ রোগ ছাড়াও কৃষিকার্যে নিয়োজিত লোকের চোখে কতকগুলি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের কৃষক সমাজ যাহাদের বিভিন্ন আবহাওয়া ও বিশেষ যন্ত্রপাতির সহিত কাজ করিতে হয়। ইহা

ছাড়াও যে সমস্ত চাষবাস করিতে হয় এবং যে সমস্ত পশুর সাহায্যে নিজেদের কাজ করাইতে হয় ইহাতে অবস্থার বিভিন্নতর রূপ দেখা যাইতে পারে।

নিম্নলিখিত যে-কোন অবস্থায় কৃষকের চোখে আঘাত বা আঘাত-জনিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(১) যে সমস্ত যন্ত্রপাতি তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে।

(২) যে-সমস্ত পশুপক্ষী কাজের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে বা পালন করিয়া থাকে।

(৩) শাক-সব্জী, ধান পাট, আখ ও তরিতরকারী ইত্যাদি যাহা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

(৪) বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়, আবহাওয়ার পরিবর্তন, যে পারিপার্শ্বিকতার ভিতরে কাজ করিতে হয় তাহাতে কতকগুলি বিশেষ রোগ অথবা কতকগুলি বিশেষ রকমের আঘাত যাহা পোকামাকড়, বিছা, আনজাইল, পাখি ইত্যাদির দ্বারা হইতে পারে।

(৫) পোষাকের ধরন এবং কাজের জন্য ব্যক্তিগত অভ্যাস।

(৬) চক্ষুরোগ, ইহাতে আঘাত এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা।

আমাদের দেশে কৃষিকার্যের জন্য সাধারণত ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে মই লাঙ্গল, জোয়াল, হেঁসো, কাস্তে, নিড়ানি, নড়ি, আলা-লাগান নড়ি, মাথাল বা বাসের ছাতা, টুকরী, দা-কোদাল, সাবল, খুড়পী, চাবুক ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের কোন কোনটির একদিক বেশ ধারালো থাকে আবার কোন কোনটির একদিকে ছোট লোহার তারকাটা লাগান থাকে। সাধা-রণভাবে এই যন্ত্রগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি যন্ত্রপাতি বাঁশের তৈরী ও ভোতা। আবার কতকগুলি ধারালো ও চোখা। এইগুলি আবার বাঁশেরও হইয়া থাকে

এবং লোহারও হইয়া থাকে। লোহার যন্ত্রপাতির ভিতরে কতকগুলি বেশ চোখা এবং কতকগুলি বেশ ভারী ও ভোতা হইয়া থাকে।

ভোতা যন্ত্রপাতির দ্বারা চোখে যে-সমস্ত আঘাত হইতে পারে সেইগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) চোখের বহির্ভাগের আঘাত।

(২) চোখের অন্তর্ভাগের আঘাত।

বহির্ভাগের আঘাতে ছাল উঠিয়া যাওয়া, চক্ষুফোলা, চক্ষুপাতায় রক্ত জমা, সংযোজক ঝিল্লিতে রক্ত জমা ,অচ্ছদপটের ছাল উঠিয়া যাওয়া, তারারন্ধ্রের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়া, চোখে রক্তজমা (হাই ফিমিয়া), পুতলি নড়িয়া যাওয়া অথবা তাহার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটা ইত্যাদি হইতে পারে।

অন্তর্ভাগের— চোখের ভিতরকার ঘন আঠালো পানিতে (ভিট্রাস) রক্তজমা, অক্ষিপট ফুলিয়া যাওয়া, (বার্লিনস্ ইডিমা) অক্ষিপট খসিয়া যাওয়া ও ছিদ্র হওয়া ইত্যাদিতে হইতে পারে। ভারী যন্ত্রের দ্বারা যেমন, কুড়াল, তাহা মারাত্মক হইতে পারে— কারণ ইহাতে অক্ষিকোটরের হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়া অক্ষিগোলক কাটিয়া যাওয়া অক্ষিস্নায়ু ছিঁড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি হইতে পারে।

যে কোন রকমের আঘাতেই পরিষ্কার পানি দিয়া চোখ এবং মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া চিত্রে প্রদর্শিত মতে (৪৭ পৃঃ দ্রঃ) পরিষ্কার কাপড় দিয়া পট্টি বাঁধিতে হইবে এবং সাথে সাথেই নিকটস্থ ডাক্তারের পরামর্শ মত কাজ করিতে হইবে।

ধারালো যন্ত্রপাতির দ্বারা

সাধারণতঃ চোখের পাতা কাটিয়া যাওয়া কোন কোন সময় কাটিয়া ঝুলিয়া পড়া, সংযোজক ঝিল্লি, অচ্ছদপট কাটিয়া যাওয়া এবং তদ্দরুন চোখের পানি (এ্যকুয়াস) বাহির হইয়া যাওয়া,

কনিনিকা (আইরিস) সম্মুখভাগে বাহির হইয়া পড়া অথবা কাটিয়া যাওয়া এবং ছিঁড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি হইতে পারে।



এক চোখের পট্টি উভয় চোখের পট্টি

আঘাত আরও গভীর হইলে অক্ষিপট (রেটিনা) এবং কৃষ্ণমণ্ডলী (করয়্যাড) ভেদ করিতে পারে এবং ইহাতে অক্ষিস্নায়ুও কাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ও অক্ষিকোটরের শীর্ষভাগ কাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এহেন অবস্থায় আঘাতকারী যন্ত্র সম্ভব হইলে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। আর তাহা সম্ভব না হইলে আঘাতকারী যন্ত্র রাখিয়াই ক্ষতস্থানের চারিপার্শ্বে সালফানিলামাইড পাউডার দিয়া আর ইহা না থাকিলে বেশী পরিমাণ পরিষ্কার কাপড় দিয়া একটু জোরে চাপ দিয়া চোখের উপর পট্টি বাঁধিতে হইবে। এবং যতসত্বর সম্ভব নিকটস্থ ডাক্তারের পরামর্শ লইতে হইবে।

পশুপক্ষীর দ্বারা

গরু বা মহিষ দিয়াই সাধারণতঃ হালচাষ করা হইয়া থাকে। লাঙ্গল ধরিয়া হাল দেওয়ার সময় গরুর পিছন পিছন হাঁটিতে হয়। গরুর লেজ নাড়াচাড়া করিবার সময় লেজের গোছার দ্বারা চোখে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে ও অনেক সময় আঘাত লাগিয়াও থাকে। ধান মাড়াইয়ের সময় ঠিক একই অবস্থাতে লেজের বাড়ি লাগে। রাখাল বালক প্রায়ই গরু চড়ানোর সময় গরুর পিছন পিছন চলে। ইহাতেও লেজ দ্বারা চোখে আঘাত লাগিয়া থাকে (কাউবয় ইনজুরী) এই আঘাত প্রথম দিকে অতি সামান্যই মনে হয় যেহেতু লেজের গুচ্ছে অতিসরু চুল থাকে এবং ইহার আঘাত ধারালো যন্ত্রের মত চোখের বিভিন্ন অংশকে জখম করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া অচ্ছদপটে যেহেতু রক্ত নাই তাই এই আঘাতের দরুন কোন রক্তক্ষরণ নাও হইতে পারে। সেইহেতু প্রথমদিকে এই আঘাত বিশেষ কোন যন্ত্রণার সৃষ্টি করে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রোগজীবাণুর দ্বারা অত্র আঘাতে সৃষ্ট প্রদাহ, যন্ত্রণা, জ্বালা-পোড়া ইত্যাদি অত্যন্ত কষ্টদায়ক উপসর্গ হয়। তখন চিকিৎসা করিলেও সব সময়ে সুফল পাওয়া নাও যাইতে পারে। ইহার জন্যই এইরূপ আঘাত বা এইরূপ আঘাতের সাথে সাথে চিকিৎসা করা উচিত। গরু মহিষের শিং ও পায়ের দ্বারাও অনেক সময় কতিপয় আঘাত হইয়া থাকে।

পাখীর ভিতরে বিশেষ করিয়া লম্বা ঠোঁট বিশিষ্ট যেমন, বক ও সারস প্রায়ই চোখে আঘাত করিয়া থাকে। চোখের মণির প্রতি বকের একটি বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে এবং প্রায়ই বকের ঠোঁট দ্বারা আঘাতজনিত রোগী চক্ষু হাসপাতালে আসে। তাই এই পাখী ধরা বা নাড়াচাড়ার করিবার জন্য সর্বদা নিজের

চোখের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অনেক সময় চোখে বোলতার ও মৌমাছির হুল হানিয়া যায়। আবার অনেক সময় মাছ ধরিবার জন্য গাছে উঠিয়া আমপিঁপড়ার ডিম সংগ্রহ করিবার সময় আমপিঁপড়া ও তাহার ডিম দ্বারা চোখে আঘাত লাগিয়া থাকে ও চোখের ক্ষতি করে।

অনেক সময় দেখা যায় মাছ ধরিবার সময়ও বড়শীর হুক চোখের ভিতরে গাঁথিয়া যায়।

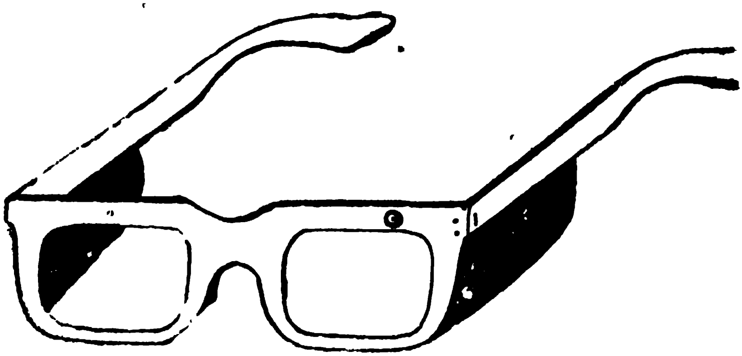
চোখে আপতিত পদার্থের ভিতরে কতকগুলি ধাতব, কতকগুলি জৈব ও কতকগুলি রাসায়নিক। ইহাদের সবগুলির দ্বারা চোখে সৃষ্ট প্রক্রিয়া এক রকম নয়। কতকগুলি কেবল ইহার আয়তন ও আকার দ্বারাই প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আর কতকগুলি আকার আয়তন ছাড়াও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা ছাড়াও ইহাদের সহিত রোগজীবাণু চোখে গিয়া নুতন উপসর্গের সৃষ্টি করে। তরিতরকারীর ও শাক-সব্জীর দ্বারা দুই রকমেরই উপসর্গ দেখা যায়। তবে ইহার ভিতরে কয়েকটি বিশেষ অবস্থার প্রতি কৃষকের সতর্ক থাকা উচিত।

ধান

ধানের পাতা ও ধান এই দুইটারই আঘাত চোখের মারাত্মক ক্ষতি করে। ধান চোখে পড়িলে তাহার শুংগুলি চোখের বিভিন্ন অংশে গাঁথিয়া যায়। ইহাতে দৈহিক প্রক্রিয়া ছাড়াও কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইয়া থাকে এবং এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াই চোখের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে।

কোন অবস্থাতেই যাহাতে চোখে ধান না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত এবং ইহার জন্য চামড়া দিয়া কিনারা বন্ধ চশমা ব্যবহার করা শ্রেয় (ছবি—১৪)। ধান কাটা, ধান মাড়ান,

ধান ঝাড়ার সময় এই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সাধারণতঃ পরিবারের মেয়েরা কুলা দিয়া বাতাসের অনুকূল অবস্থায় ধান ঝাড়িয়া থাকে। এই সময়ে আশেপাশে যে সমস্ত লোকজন বিশেষ



ছবি – ১৪

করিয়া ছেলেমেয়েরা, যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে তাহাদের চোখে তুষ, কুঁড়া ও ধানের শুং বা ধান চোখে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই রকম অবস্থায় কাউকে ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতে না দেওয়াই উচিত। বিশেষ করিয়া কোলের বাচ্চাদের নিকটে না রাখিয়া একটু তফাতে বাতাসের প্রতিকূলের দিকে রাখা উচিত। কৃষকের আঘাতজনিত কারণে যত চোখ নষ্ট হইয়া থাকে তাহার বেশীর ভাগই ধানের আঘাতে হইয়া থাকে। প্রথম দিকে ইহার উপসর্গ খুব বেশী হয় না। কিন্তু দুই তিন দিন পরেই অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থা ধারণ করে। তাই ধান পড়িলেই চোখ না রগড়াইয়া অতি মৃদুভাবে ধানটি সরাইয়া নিকটস্থ ডাক্তারকে দেখাইতে হইবে।

গম

ধানের মত ইহাও উপসর্গ সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার আঘাতও চোখের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ধানের পাতা বেশ ধারালো

থাকে। তাই ইহার আঘাতে চোখের বিভিন্ন অংশ কাটিয়া যায়। কাটিয়া যাওয়া অংশগুলিকে তাহার নির্দিষ্ট স্থানমত বসাইয়া জোড়া দিতে হয়। সেইজন্যই চোখের কোন অংশ কাটিয়া গেলে সাথে সাথেই ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া উচিত। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে চোখে কোন কোন রোগে চাউল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সাবধান কোন অবস্থাতেই চোখের ভিতর চাউল দিতে নাই।

আখ

আখের পাতা অত্যন্ত ধারালো। ইহার আঘাতে চোখের অচ্ছদপট সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ডিত হইতেও আমরা দেখিয়াছি। আখ কাটা বা আখ ক্ষেতে কাজ করার সময় উপরোক্ত নিয়মে প্রতিরক্ষা-মূলক চশমা ব্যবহার করা উচিত।

পাট

চোখে পাট গাছের আঘাত খুব বেশী দেখা যায় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাটশলা ও পাট দ্বারাই আঘাত হইয়া থাকে। পাট ধোয়ার সময় ইহার অগ্রভাগ দ্বারা চোখের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাটক্ষেতে কাজ করার সময় পাট গাছের পোকা চোখে পড়িতে দেখা যায় (ছবি—১৫)। পাট ধোয়ার সময় ছোট ছোট পাটের আশ এবং ধান মাড়ানোর সময় ধানের গুঁড়া ইত্যাদি দ্বারা চোখে রাসুড়া নামক একরকম রোগের সৃষ্টি হয়।

খেজুরের কাঁটা

খেজুরের রস আহরণকারী (গাছী) লোকের জন্য খেজুর কাঁটা আর একটি বিপদ। খেজুরের কাটা চোখের বিভিন্ন অংশে গাঁথে এবং ছিদ্র করিয়া চোখের ভিতরকার পানি নির্গমনের সুযোগ করিয়া দেয়। যাহার জন্য এই আঘাত চোখের পক্ষে এত ক্ষতিকারক।

উল্লিখিত সর্বরকমের আঘাতেই ধনুষ্টংকার বা (টিটেনাস) রোগের বীজাণু চোখে ঢোকার সম্ভাবনা থাকে। অন্যান্য সব-রকমের শাকসব্জী ও তরিতরকারীর কুটা চোখে নানারকম প্রক্রিয়া করিতে পারে।



ছবি—১৫

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে নানারকমের পোকার উপদ্রব বাড়ে। কতকগুলি পোকা আছে যাহাদের চোখ এবং চোখের আশেপাশের স্থানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে বলিয়া মনে হয়। ইহাদের ভিতরেও আবার কতকগুলি মারাত্মক উপসর্গের সৃষ্টি করে। পোকার দ্বারা আঘাত ছাড়াও পোকার কামড়েও নানা উপসর্গ হয়। কামড়ের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ফরমিক এ্যাসিড নির্গত হয় এবং পোকার গায়ের গুঁড়াজাতীয় জিনিস দ্বারা নানারকমের এ্যালার্জিক উপসর্গ দেখা যায়।

চাষীকে মাঠে প্রায়ই খালি গা, খালি পা নিয়া খোলামাঠে কাজ করিতে হয়। সে সমস্ত মাঠে পশুর মলমূত্র ছাড়াও মানুষের মলমূত্র খোলা অবস্থায় ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত থাকে। সময়

সময় মাঠের ভিতরেই ছোট ছোট গর্ত ও নালাতে যে পানি পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই নিজের খাওয়া-দাওয়ার কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাতে প্রায় সকল চাষীরই বিভিন্ন ধরনের কৃমির সংক্রমণ হইয়া থাকে। কৃমির আক্রমণে শরীরের বিভিন্ন ধরনের রোগ ছাড়াও চোখে 'এ্যালার্জিক' প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

চাষীরা ক্ষেতে বসিয়াই হুকাতে তামাক খাইয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় গরম ছাই বা স্ফুলিঙ্গ চোখে পড়ে ও চোখের ক্ষতি করে। বিশেষ করিয়া কলকির আগুনে ফুক দেওয়ার সময় এই ধরনের চোখের আঘাত বা কর্নিয়া পুড়িয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক (ছবি ১৬)।



ছবি—১৬

গরু মহিষের গায়ে ঘা হইয়া থাকিলে মাছি বসিয়া বসিয়া সেখানে ডিম পাড়ে ও নূতন কীটের সৃষ্টি হয়। এই রকমের জখমী

পশু বাসগৃহের আশেপাশে থাকিলে শরীরের যে-কোন স্থানের ক্ষত অবস্থায় মাছির দ্বারা সেই ক্ষত স্থানেও সংক্রমিত হইতে পারে। কীট দ্বারা সংক্রমিত এই রকম চোখের শূককীটজনিত প্রদাহ আমরা কয়েকটি দেখিতে পাইয়াছি। গরু মহিষকে বাসগৃহ হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখা উচিত এবং পশুর ক্ষতস্থান সর্বদাই কাপড় দিয়া পট্টি বাঁধিয়া রাখা উচিত।

যে-কোন রকমের রোগশোক হইতে মানুষ আদিকাল হইতে নানারকমের পন্থা অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছে। ব্যারাম হইতে আরাম পাওয়ার জন্য দেবদেবীর পূজা, অর্চনা, চন্দ্র, সূর্যের স্তুতিগান, পাথর বা ধাতব পদার্থের ব্যবহার, গাছগাছড়ার রসের ব্যবহার; পশুপক্ষী অথবা নানারকম প্রাণীর অঙ্গ বিশেষের ব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়া ঝাড়া, ফুঁকা, পানিপড়া তাবিজ বা মাদুলী ইত্যাদির ব্যবহার এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা স্থিরিকৃত ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের ভিতরে অনেকগুলিই অনেক অসুখের জন্য ক্ষতিকারক। নানাসংস্কার, রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও বিকৃত ধারণা, পেশাধারী ওঝা ও স্বঘোষিত (self style) 'বৈত্তপণ' চোখের রোগের জন্য অনেক রকমের ক্ষতিকারক চিকিৎসা দিয়া থাকে। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় এরকমের অত্যন্ত ক্ষতিকারক কতকগুলি চিকিৎসা পদ্ধতি ও নষ্ট চোখ দেখিতে পাই। ইহা হইতে সকলের সাবধান থাকা উচিত।

চোখের ব্যথায় বকের ঠোঁট দ্বারা কপালে দাগ দেওয়া, চোখের প্রদাহে "টেলকাম পাউডারের" ব্যবহার, আতর, দুধ, বিশেষ করিয়া মায়ের দুধ চোখে ব্যবহার করে। ইহা ছাড়াও হুক্কার পানি, শামুকের পানি ইত্যাদির দ্বারা চোখ ধৌত করা, কোন কোন অসুখে গাঁদা ফুলের পাতার রস, বাকলা গাছের

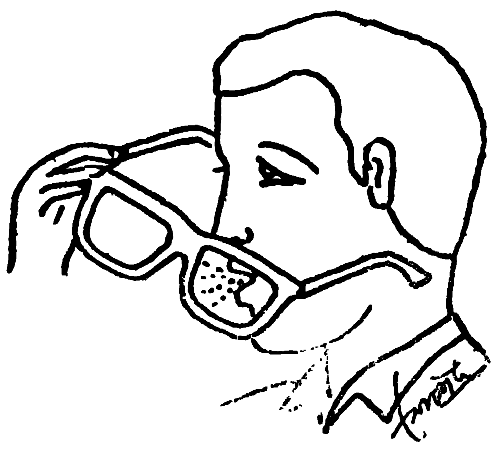
পাতার রস, নাম না জানা গাছের শিকড় ইত্যাদি চোখে ব্যবহার করিয়া বহু চোখ নষ্ট হইতে দেখা যায়।

সাবধান—কোন সময়েই (self style) স্বঘোষিত বৈদ্য, ওঝা ইত্যাদি হইতে গাছের রস, পাতার রস, নানাবিধ ছাল ইত্যাদি চোখে ব্যবহার করিয়া সৃষ্টির অমূল্য দান এই চক্ষুকে নষ্ট করিবেন না। সর্বদাই চিকিৎসকের পরামর্শমত কাজ করিবেন।

চশমার যত্ন

(১) চশমা ঠিকমত ও নিয়মমত কান, নাক ও চোখের সামনে না বসিলে নানারকমের অসুবিধা হয়। তাই চশমা লইবার সময় চশমা ঠিকমত 'ফিট' করিয়াছে কিনা ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে এবং কিছুদিন পর পর চশমা সরবরাহকারীকে দিয়া ঠিকঠাক করাইয়া লইতে হইবে যেহেতু কিছুদিন ব্যবহারে ফ্রেম নরম হইতে পারে অথবা ঢিলা হইতে পারে।

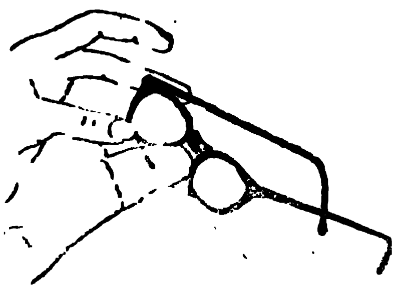
(২) কখনও চশমা পরিষ্কার করিবা সময় ইহাতে নিশ্বাস ফেলা উচিত নয় (ছবি—১৭)। চশমা যখন শুকনা থাকে তখনই ইহা পরিষ্কার করিতে হয়।



ছবি—১৭

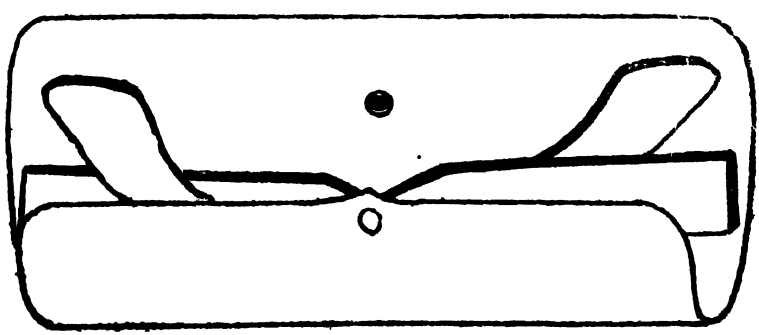
(৩) চশমা সর্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। চশমার কাচ ও ফ্রেমে ময়লা জমিতে পারে। এই সমস্ত ময়লা জমিয়া থাকার

দরুন কেবল যে দেখিতে অসুবিধা হয় এমন নয় ইহাতে রোগের জীবাণুও থাকিতে পারে ও বর্ধিত হইতে পারে। ইহা পরিষ্কার করিবার উত্তম ব্যবস্থা ছবিতে দেখানো হইয়াছে (ছবি—১৮)। ইহা ছাড়াও সামান্য গরম পানি ও সাবান দিয়া ধুইয়া চশমাকে পরিষ্কার রাখা যায়। চশমা পরিষ্কার করিবার এক রকমের কাগজও কিনিতে পাওয়া যায়।



ছবি - ১৮

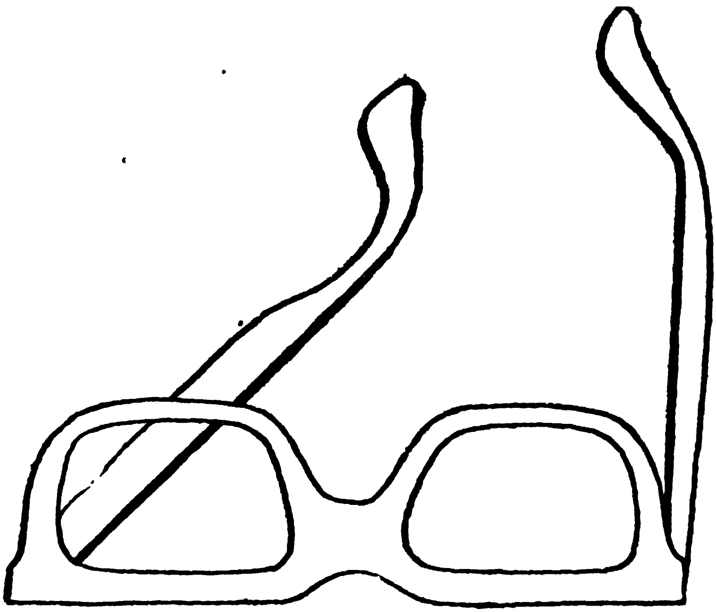
(৪) চশমা যখন ব্যবহার করা হয় না, সেই সময় তাহার খাপের ভিতরে রাখিতে হইবে। এইরূপ রাখার একটি বিশেষ নিয়ম আছে। ছবিতে ইহা দেখানো হইয়াছে (ছবি ১৯)।



ছবি—১৯

কোন সময়েই চশমা ইহার কাচের উপর রাখা উচিত নয়।

ইহাতে চশমাতে দাগ পড়ে। যদি কোন সময় খাপ না থাকিয়া থাকে তবে এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে চশমা তাহার ফ্রেমের বাহুর উপর ভর করিয়া থাকিতে পারে অথবা ইহার বাহুর উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে (ছবি—২০)।

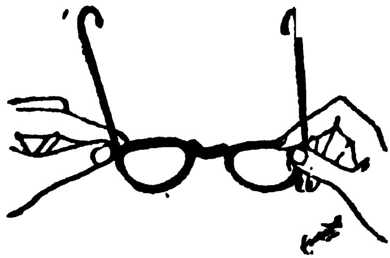


ছবি—২০

(৫) চশমা কখনও তাহার কাচে ধরিয়া নামাইতে উঠাইতে বা চোখে বসাইতে বা নাড়াচাড়া করিতে নাই। সর্বদাই দুই হাতে ধরিয়া চশমা খুব আস্তে আস্তে সরাইতে বা বসাইতে হয় (ছবি ২১)।

(৬) একহাত দিয়া চশমা সরাইলে ইহাতে ফ্রেমের আকৃতি পরিবর্তন হইতে পারে অথবা ইহা বাঁকাইতে পারে। এইরূপ করাতে চশমায় দাগ পড়া ছাড়াও কাটার সম্ভাবনা থাকে।

গরম জিনিস, যেমন চা ও গরম দুধ ইত্যাদি এমনভাবে খাইতে হইবে যাহাতে চশমায় বাষ্প না লাগে।



ছবি ২১

(৭) শীতের সময় কুয়াশা চশমাতে লাগিয়া অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে। চশমার উপরে খুব পাতলা করিয়া সাবান লাগাইয়া তাহাকে কাপড় দিয়া মুছিয়া লইলে অতি পাতলা এবং ক্ষীণ সাবানের একটি স্তর চশমার উপর পড়িয়া থাকে, ফলে কুয়াশা পড়িলে উহা চশমার উপর আর লাগে না। ইহাতে কয়েক ঘণ্টা বা একদিন পর্যন্ত চশমার কাচকে কুয়াশা হইতে বাঁচান যায়।

চোখের ব্যায়াম

চোখের বিভিন্ন অংশের সুস্থতা ও সবলতা ইহার স্বাভাবিক কাজের সহায়ক। চোখের মাংসপেশীর স্বাভাবিক অবস্থান ও কর্মক্ষমতাই চোখের নিয়মমত নড়াচড়া করিবার জন্য দায়ী। তাই মাংসপেশীগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিবার জন্য যত্নবান হইতে হয়। নিকট দৃষ্টির জন্য চোখের উপযোজন অপরিহার্য এবং ইহা না হইলে কিছুতেই দৃষ্টির স্বাচ্ছন্দ্য বিধান হয় না। সিলিয়ারী' নামক মাংসপেশীই এই উপযোজনের (accommodation) কাজ করিয়া থাকে। তাই "সিলিয়ারী" মাংসপেশীর সংকোচন ও সম্প্রসারণ (Relaxation) এর উপর নিকট দৃষ্টি ও দুরদৃষ্টির স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভরশীল। ইহা ছাড়াও অচ্ছদপট (কর্নিয়া) ও রেটিনা (অক্ষিপট) এর স্বাভাবিক অবস্থা ও অক্ষিস্নায়ুর (অপটিক নার্ভ) সুস্থতার উপর দৃষ্টির সুস্থতা নির্ভরশীল।

এই স্বাভাবিক অবস্থান কর্মক্ষমতা ও সুস্থতা ইহার (Nutrition) পুষ্টির উপর নির্ভর করে। চোখের পুষ্টি শরীরের সাধারণ পুষ্টির উপর নির্ভরশীল। তাই খাদ্য নিয়মিত কার্বহাইড্রেট (শর্করা) প্রোটিন ও চর্বির সহিত পরিমাণমত ভিটামিন (খাদ্য প্রাণ) ও খনিজ অংশ সহ হওয়া উচিত। চোখের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'এ' এবং বিভিন্ন ভিটামিন 'বি'। 'ভিস্যুয়েল পারপল' তৈয়ারীর জন্য ভিটামিন 'এ' দরকারী। ইহার অভাবে সামান্য অন্ধকারে অত্যন্ত দেরীতে দেখা বা না দেখার অবস্থা

হইতে পারে। ইহা ছাড়াও চোখের অন্যান্য রোগ হয়। 'বি' দলীয় ভিটামিনের অভাবে (অপটিক নিউরাইটিস্) অক্ষিস্নায়ুর প্রদাহ, কর্নিয়াতে রক্তনালী সৃষ্টি ইত্যাদি হয়। দুধ, মাখন, পনীর ডিম লিভার, সবুজ তরিতরকারীতে ভিটামিন 'এ' আর সীমের বীচ, গম, গমের খোসা ছোলা ও ছোলার খোসা ও অঙ্কুরিত বীচিতে ভিটামিন 'বি' থাকে। তরিতরকারীর মধ্যে কচু কলমী শাক, পুঁইশাক, ডাঁটা শাক খেসারী ডাল মসুর ডাল এইগুলিতে অধিক পরিমাণে ভিটামিন 'বি' আছে। মৌসুমী তরিতরকারী যেমন, ওলকপি, বাঁধাকপি, কাঁচাকলা, পেপে, ঝিঙ্গা ইত্যাদি আমাদের দেশীয় মৌসুমী প্রায় সব তরিতরকারীতে কিছু না কিছু ভিটামিন আছে।

মাছের ভিতরে চিংড়ি, চান্দা, পাবদা, ট্যাংরা, পুটি, আইড় মাগুর ইত্যাদি মাছে প্রচুর ভিটামিন আছে। দিনের ভিতর এক সময় খালি চোখে ক্ষুধার্ত অবস্থা ছাড়া বেশ আরামে বসিয়া খুব আস্তে আস্তে চোখ যথাসম্ভব উপরের দিকে উঠাইয়া একটু সময় (৫/৭ সেকেণ্ড) স্থির রাখিয়া আবার খুব আস্তে আস্তে যথাসম্ভব নীচের দিকে নামাইতে হইবে। এবারেও কয়েক সেকেণ্ড চোখ স্থির রাখিতে হইবে। তৎপর আস্তে আস্তে ডানের দিকে যতদুর দৃষ্টি লওয়া যায় ততদুর লইতে হইবে। কিছুক্ষণ স্থির রাখার পর আবার বায়ের দিকে নিতে হইবে। কিছুক্ষণ স্থির রাখার পর ঠিক সোজাভাবে সামনের দিকে তাকাইতে হইবে এবং এই অবস্থায় চোখ দুইটি স্থির রাখিতে হইবে ঠিক ততক্ষণ, যতক্ষণ অন্যান্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। তারপর আবার চার নিয়মে চোখ ঘুরাইতে হইবে। একবারে পাঁচ সাত বারের বেশী করা উচিত নয়। মনে রাখা উচিত তাড়াহুড়া করিলে কোন লাভ হইবে না এবং মাংসপেশী

বেশী পরিশ্রান্ত হইবে। অতি ধীরে চোখ দুইটি ঘোরানোর উপরই ইহার সফলতা নির্ভরশীল। যদি আস্তে আস্তে নড়াইতে অসুবিধা হয় তবে কোন লম্বাবস্তু অথবা গাছপালা নিকটস্থ সুপারী, খেজুর ও তালগাছ অথবা নেহায়েত পক্ষে দরজার চৌকাঠ বা জানালার শিক ইত্যাদির প্রতি চক্ষু স্থির করিয়া এবং ইহার একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি লইয়া এই ব্যায়াম করা যাইতে পারে। ইহাতে মাংসপেশীর রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও ইহারা সুস্থ ও সবল থাকে।

সিলিয়ারী মাংসপেশীর পূর্ণ বিশ্রাম : নানা উপায়ে এই মাংসপেশীকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া যাইতে পারে। সবচাইতে সোজা ও সহজসাধ্য উপায় হইল সকালে অথবা সন্ধ্যার সময় খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া অথবা ঘরের ছাদে দাঁড়াইয়া নীল আকাশের দিকে বা দিগন্তের দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। ইহার অভাবে বসিয়া বা বিছানায় শুইয়া চক্ষু বন্ধ অথবা খোলা রাখিয়া (বন্ধ রাখিলেই ভাল হয়)। অতিদূরবর্তী অত্যন্ত পরিচিত কোন স্থান, বস্তু বা নিজের ঘরবাড়ীর ছবি কল্পনা করা। কল্পনায় কোন মধুর স্মৃতির কথা স্মরণ করিলেও চলিবে। ইহাতে সিলিয়ারী মাংসপেশীর পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া যায়।

এই পেশীর সবলতা বৃদ্ধির জন্য পুনঃ পুনঃ সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের ব্যায়াম দরকারী। ইহার জন্য চক্ষুকে নিজের ডানহস্ত সম্প্রসারিত করিয়া ইহার এক আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি স্থির করিতে হইবে। এর পর মুহূর্তেই দূরবর্তী কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি স্থির করিতে হইবে। ঘরের দরজা জানালা বা কোন গাছপালাকে দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তু করিয়া এই ব্যায়াম করিতে হয়। একবারে পাঁচ সাত বারের বেশী করিতে নাই। এই ব্যায়ামে যত তাড়াতাড়ি চক্ষু নিকটবর্তী

বস্তু হইতে দূরবর্তী বস্তু আবার দূরবর্তী বস্তু হইতে নিকটবর্তী বস্তুতে চক্ষু স্থির করা যাইবে ততই ভাল।

প্রতি সন্ধ্যার পর পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি দিয়া চোখ ও মুখ খুব ভাল করিয়া ধুইলেও চোখের লাভ হয়।

চশমার ইতিকথা

দৃষ্টিশক্তির প্রক্রিয়া মানুষের কাছে এক রহস্য। অতি প্রাচীন-কাল হইতে মানুষ ইহার নানা ব্যাখ্যা হাজির করিয়াছে। কিন্তু সঠিক ভাবে বুঝিতে পারে নাই কিভাবে তাহা চোখ দিয়া কোন বস্তুকে দেখে। ডেমোক্রাইটাস্ (DEMOCRITUS : ৪৬০ –৩৭০ খ্রী পূঃ) বলিলেন আমরা কোন বস্তু দেখি যখন ঐ বস্তু থেকে উদ্ভূত কণিকাসমূহ আমাদের চক্ষুতে আঘাত হানে। তাহার চক্ষুর গঠন সম্পর্কে ধারণা ছিল যে ইহা সমজাতীয় এক পদার্থ দ্বারা পূর্ণ এবং এক ফাঁপা অপটিক নার্ভ (OPTIC NERVE)। অন্য এক গ্রীক দার্শনিক বলেন যে চক্ষু কতকগুলি অনুভূতিপ্রবণ সাড়া দৃষ্ট বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে যাহা দ্রুতগতিতে তথ্য লইয়া ফিরিয়া আসে। অপর পক্ষে অন্যেরা বিশ্বাস করেন যে, অনুভূতিশীল সাড়া চোখ হইতে ঠিকই বিচ্ছুরিত হয় কিন্তু সেই-গুলি দৃষ্ট বস্তুর থেকে উদ্ভূত আলোক কণিকার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং দৃষ্টি ঘটায়।

এই তথ্য পূর্ববর্তী তথ্য হইতে উন্নততর। সত্যি বলিতে কি আলহাজেনএর সময় পর্যন্ত এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর নানা চিন্তা হচ্ছিল। এই আরবীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিদ ও আলোক-বিজ্ঞানবিদ প্রথম ব্যক্তি যিনি বলেন যে, আমরা তখনই কোন বস্তুকে দেখিতে পাই, যখন ঐ বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত আলোক কণা আমাদের অক্ষিপটে প্রতিবিম্বিত করে। ক্যামেরার কার্যপ্রণালীও তিনিই ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখিলেন যে, ক্যামেরার পর্দা ও অক্ষিপট একই পর্যায়ভুক্ত এবং লেন্স্ আলোক-রশ্মিগুলিকে অক্ষিপটের দিকে

কেন্দ্রীভূত করে। ইব্‌নে রুশদ্‌ অক্ষিপটের ব্যাখ্যা দেন (খ্রীঃ ১১২৬—১১৮৮)। ইবনে হাইসাম আপতিত কোণ ও প্রতিফলিত কোণের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। গ্যালেনের ধারণা ছিল (১৩১—২০১ খ্রীঃ পূঃ) যে ক্রিসটালিন লেন্‌সের (Crystalline Lens) উপর প্রতিবিম্ব হয়। মেশানির ফ্রাসিস কোমৌরোলি-কাস (Fracis Comourolycus) বলিলেন প্রতিবিম্ব অক্ষিপটে তৈয়ারী হয় এবং ইহা তৈয়ারীর জন্য অক্ষিপট অপরিহার্য। ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে নিউটন আলোক সম্বন্ধীয় করপাসকুলার থিওরী দেন। পতুর্গীজ পদার্থবিদ হাইজেন ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে ওয়েভ বা আনদিউলেটরী থিওরী দেন। ওয়েভ থিওরী গ্রহণযোগ্য। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল বলেন যে আলোকের স্বরণ ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক প্রকৃতির। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে রঞ্জনের রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার ঘটে। অবশেষে মহাজাগতিক রশ্মি থিওরী (cosmic ray theory) সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আলোক-রশ্মি সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার সর্বশেষ তথ্য হইল আইনস্টাইনের কোয়ানটাম থিওরী।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে অ্যানাটমিস্ট ও পদার্থবিদ্যা বিশারদ ভ্যাসালিয়াস দেখিলেন যে, ক্রিস্‌টালিন লেন্‌স উত্তল কাঁচের ন্যায় কাজ করে। দর্শনক্রিয়ার সাহায্যের ক্ষেত্রে এই আবি-ষ্কার এক বিরাট অবদান। দর্শনক্রিয়ার বিভিন্ন ত্রুটি এখনও অজানা রহিয়াছে। ইহা দেখা গিয়াছে যে বয়সের একটা বিশেষ স্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুসমূহকে কিছু দুরে সরাইয়া না লইলে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে চোখকে দৃষ্ট বস্তু থেকে কিছুটা দুরে সরাইয়া লইতে হইতে পারে। পতুর্গীজ চক্ষু বিশারদ ডনডারস ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে চক্ষুদৃষ্টির এই অবস্থার কারণগুলির বিবরণ দেন এবং ইহাকে চাল্‌সে ধরা (Presbyopia) বলেন। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে টমাস ইয়ং অ্যাসটি-গমেটিজমের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেন। যদিও এই অবস্থাগুলির

সঠিক কারণ জানা যায় নাই তথাপি অনেক পূর্ব হইতে দৃষ্টিশক্তি বাড়াইবার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা শুরু হয়। গ্রীক ও রোমানদের সমসাময়িক যুগে মানুষ জলভরা ফাঁপা গোলাকৃতি কাচের বৃহত্তিকরণের (Magnifying) গুণ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। নিনেভা ও পম্পাই নগর খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তখনকার যুগে মানুষ হ্রস্ব ফোকাল লেংথবিশিষ্ট কাচের ব্যবহার জানিত। এই ধরনের আতশকাচকে আগুন ধরাইবার কাজে ব্যবহার করা হইত।

রজার ব্যাকন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোন জিনিসকে বড় করিয়া দেখিবার জন্য উত্তল কাচের ব্যবহারের কথা বলেন। ব্যাকনের গোলাকৃতি অবতল লেন্‌সের ব্যবহারবিধি জানা ছিল।

জন পেকহাম ইহার পর উন্নততর দৃষ্টির জন্য লেন্স ব্যবহারের কথা বলেন। গ্যাওভান ডেলা পোরটা (Giovanni Della Porta) একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানী ও আলোকবিজ্ঞান বিশারদ। তিনি গোলাকৃতি অবতল লেন্‌সের ব্যবহারের কথা বলেন নিকট-দৃষ্টির (Myopia) ক্ষেত্রে। স্যার জর্জ বিড্‌ল অ্যারি চোঙাকৃতি লেন্‌স ব্যবহার করেন অ্যাসটিগম্যাটিজমে (Astigmatism)। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে গোলাকার চশমায় চোঙাকৃতি লেন্স ব্যবহার করা হয়। রোগীরা সঠিক দৃষ্টির জন্য উহার ব্যবহার কৌশল বাহির করেন। অবতল লেন্সের (concave lens) ব্যবহার উত্তল লেন্সের (convex lens) পরে শুরু হয়। ১৪৭৫ খ্রীস্টাব্দে র‍্যাফেল অবতল কাচের সাহায্যে পোপ লিওর ছবি আঁকেন। কাজেই নিকট-দৃষ্টি থেকে মুক্ত হইবার জন্য অবতল লেন্সের ব্যবহার বেশী হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইহার ব্যবহার বেশী করে শুরু হয়। মন্টিপিলার-এর মেডিকেল স্কুলে গর্ডনের বারনার্ড ১৩০৫ খ্রীস্টাব্দে নিকট-দৃষ্টি নিরসনের জন্য তাঁর প্রথম চিকিৎসা-ব্যবস্থাপত্রে অবতল কাচের ব্যবহার উল্লেখ করেন। ইটালীর চিকিৎসাবিদ

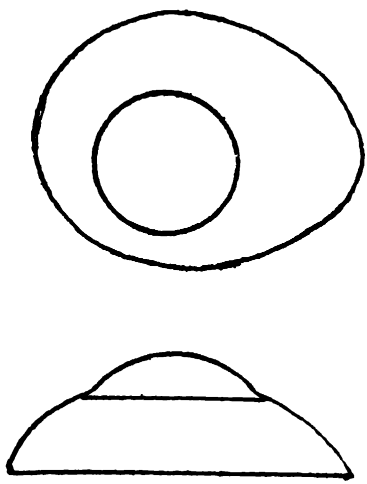
মনটানেস চশমার প্রতি বিশেষ জোর দেন। ইহা বলা শক্ত কে এবং কখন প্রথম চশমা আবিষ্কার ও দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি নিরসনে ইহার ব্যবস্থা করেন। স্তলভিনো ভ্য আরম্যাটো ডিগ্‌লি আরম্যাটি এবং অ্যালিসান ডি ডেলা স্পাইনা—এই দুইটি নাম চশমা আবিষ্কার-এর ক্ষেত্রে উচ্চারিত হইয়া থাকে। আরম্যাটোর আবিষ্কার সময় ধরা হয় ১২৮৫ খ্রীস্টাব্দকে। আরম্যাটোর সমাধিতে খোদিত ছিল "এখানে চশমার আবিষ্কর্তা ফ্লোরেন্‌সের স্তলভিনো ভি আরম্যাটো ডিগ্‌লি আরম্যাটি চিরনিদ্রায় শায়িত। ঈশ্বর তাঁর পাপরাশি ক্ষমা করুন। মৃত্যু : ১৩১৭ খ্রীস্টাব্দ।"

কিন্তু তাঁর নাম চশমা আবিষ্কর্তা হিসাবে বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। ঐ সময় চীন, ফ্লানডার ও জার্মানীতে বিভিন্ন ধরনের চশমার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহান আগ্রার দুর্গ থেকে তাজমহল দেখিবার জন্য ইমারাল্‌ড ব্যবহার করিতেন।

পরবর্তী উন্নতির ধাপ হইল দ্বিকেন্দ্রিক চশমা (Bifocal lens)। এই ক্ষেত্রে দুই খণ্ড কাচ ব্যবহার করা হয়। উপরের অংশ দূর-দৃষ্টির জন্য ও নীচের অংশ নিকট-দৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে বেন্‌জামিন ফ্রাংকলিন দুই টুকরা কাচকে একত্রে ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এই চশমা একই ফ্রেমে ব্যবহার করা হয়। কাচের দুই অংশ আনুভূমিকভাবে পরস্পর পৃথক থাকে। সাধারণতঃ কোন আঠাল পদার্থ দিয়া কাচ দুইটাকে যুক্ত রাখা হয়। Supplementary 'ওয়েফার' দ্বারা ইহার আরও উন্নতি করা হয়। কিন্তু ইহাতে কতগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যায়। যেমন শুষ্কতা ও সহজে নরম হইয়া যাওয়া, এবং কিছুটা নড়বড়ে হইয়া যাওয়া। ইহার পর ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে বর্‌স ইনসারটেভ 'ওয়েফার' দ্বারা ইহার আরও উন্নতি করেন। ইহার দ্বারা উপরোক্ত ত্রুটিগুলি দূরীভূত হয়। তৎপর দুই খণ্ড কাচকে একত্রীভূত করা হয় এবং সংবদ্ধ বাইফোকাল (Fused

bifocal) চশমার প্রচলন হয়। ইহাতে কাচের জোড়া সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। দ্বিকেন্দ্রিক যৌগিক আস্ত চশমা এই শ্রেণীর সর্ব-শেষ উন্নত সংস্করণ। ইহা যন্ত্র-বিজ্ঞানের অবদানবিশেষ। ইহার পর ত্রিকেন্দ্রিক চশমার প্রচলন হয়। ইহার উপরের অংশ দুর-দৃষ্টির জন্য, মধ্যের অংশ মাধ্যমিক দুরত্বের জন্য এবং নীচের অংশ নিকট-দৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশেষে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মন্ট্রিয়লের গোলান বহুকেন্দ্রিক চশমার প্রচলন করেন। নিকট-দৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত চশমার আকার ও অবস্থান নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার দরুন লেখাপড়া বা নিকট-দৃষ্টির বহু বাধা-বিপত্তি দুরীভূত হইয়াছে। ইহা এইরূপ '⌓' আকৃতি বিশিষ্ট। চশমার ফ্রেম হইতে সামান্য উপরে ইহার অবস্থান দ্বারা লেখাপড়া আরামপ্রদ করা হয়।

অতঃপর চশমা সরাসরি চোখের উপর স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এইক্ষেত্রে ব্যবহৃত চশমাকে সংস্পর্শ চশমা (contact lens)

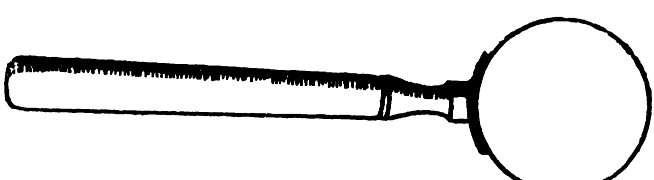


ছবি—২২

(ছবি—২২) বলে। এই চশমা ফ্রেমে যুক্ত না করিয়া আঙ্গুল দ্বারা সরাসরি চোখের উপর স্থাপন করা হয়। ইহা চোখের নড়াচড়ার

সাথে নড়াচড়া করিতে পারে। যখন ইহা ব্যবহার করা না হয় তখন নকল দাঁতের মত ইহাকে বাইরে রাখা যায়। এই সিরিজের পরবর্তী উন্নত অবস্থা হইল চশমাকে সরাসরি চোখের ভিতরে স্থাপন করা। ইহাকে এক্রিলিক ইম্‌প্ল্যান্ট বলে। এইখানে চশমাটি চোখের সম্মুখ প্রকোষ্ঠে (Anterior chamber) স্থাপন করা হয়। এই অবস্থায় চশমাটি ফ্রেমে অথবা সংস্পর্শ চশমার ন্যায় চোখের উপরে ব্যবহার করা হয় না। পরবর্তী পরিবর্তন ও উন্নতি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

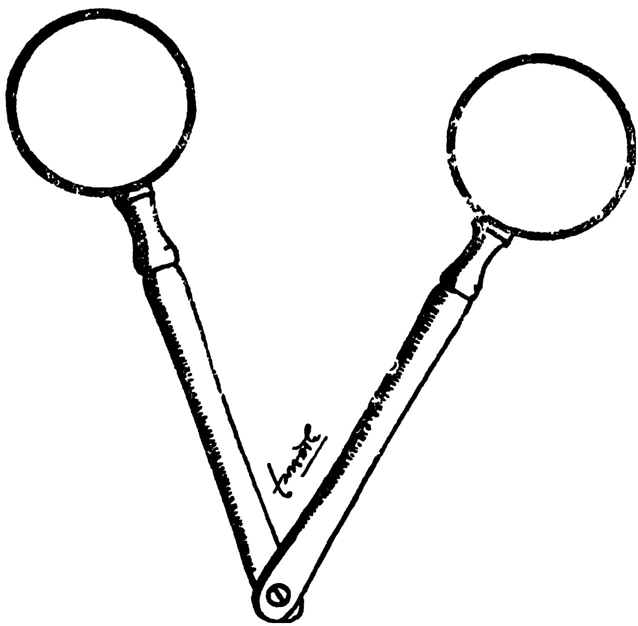
চোখের দৃষ্টি ও চশমা সম্বন্ধে মানব-জ্ঞান বিকাশের ধারা যাহাই হোক না কেন অতীতের জ্ঞানবিচারে ফ্রেমের ইতিবৃত্ত সত্যিই চিত্তা-কর্ষক। ফ্রেমের ইদানিংতম সংস্করণ তৈয়ারী করিতে মানব উদ্ভাবন শক্তির অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ পড়িবার জন্য এক লেন্‌সই ব্যবহার করিত। কিন্তু সমস্যা হইল কিভাবে ইহাকে ধরিয়া রাখা যায়। এই সমস্যার সমাধান হইল লেন্সটিকে একটি হাতলের সঙ্গে যুক্ত করে। হাতলটি সচরাচর কাঠ দ্বারাই তৈয়ারী হইত। লেন্সটিকে এক হাতে ধরিয়া শব্দ হইতে শব্দান্তরে, বাক্য হইতে বাক্যান্তরে, এমনি করিয়া উপর হইতে নীচে এবং এক পাশ হইতে অপর পাশে ঘুরাইয়া ইহাকে ব্যবহার করা হইত।



ছবি—২৩

আজকালকার গোলাকার আতশ কাচ যেমন ব্যবহৃত হয় ব্যাপারটি অনেকটা তেমনি ছিল (ছবি—২৩)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মানুষ দুই লেন্স-এর ব্যবহার করিবার চিন্তা শুরু করে এবং মানুষ এই ধরনের

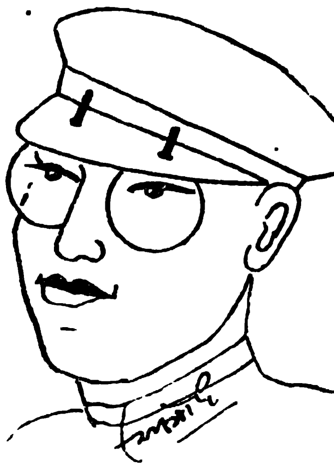
লেন্স ব্যবহারে সুফল পায়। কিন্তু কিভাবে ইহাকে ধরিয়া রাখা যায় ইহা একটি সমস্যা হইয়া রহিল। একদিকে সংযুক্ত একটি ফ্রেমের অপর প্রান্তে দুইটা লেন্সকেই যুক্ত এবং সংবদ্ধ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হইল। ইহা দেখিতে "V" (ছবি—২৪) এর মতো।



ছবি—২৪

দুই চোখের মধ্যকার দূরত্বের সমব্যবধানে লেন্স দুইটাকে উপরি স্থাপন করা হইল। এই ফ্রেম তৈয়ারীর জন্য যেইসব জিনিস ব্যবহৃত হইত তাহা ছিল প্রধানতঃ কাঠ, লৌহ ও হাড়। কিন্তু বিভিন্ন মানুষের আন্তঃঅক্ষি দূরত্বের বিভিন্নতার ফলে সকলেই একই ফ্রেম ব্যবহার করিতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ফ্রেমের তলার দিকে কব্জার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং লেন্সদ্বয়কে একটি আনুভূমিক

দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। স্যাভোনোরলা (Savonorola) প্রস্তাব দেন যে, লেন্সযুক্ত ফ্রেমটিকে একটি টুপির সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে (ছবি—২৫)। এমনিভাবে লেন্সযুক্ত



ছবি—২৫

টুপিকে যখনই নীচের দিকে নামানো যাইবে তখনই লেন্সদ্বয় চোখের সামনে উপস্থাপিত হইবে। চশমা ব্যবহারের এই পদ্ধতি সুবিধাজনক বলিয়া গৃহীত হয়। লেন্স দুইটিকে দড়ির সহযোগে কানের উপর দিয়া ঘুরাইয়া মাথার পিছনে বাঁধিয়া স্বস্থানে রাখিবার চিন্তা পরে করা হয়। অক্‌সিপুট-এর নীচের দিক গ্রন্থির জন্য বাছিয়া লওয়া হইল এবং দড়ির অবশিষ্টাংশ একটি চুটকির মতো ঐখানে ঝুলিয়া থাকে (ছবি—২৬)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনারা কপালের উপর লেন্সযুক্ত দণ্ডের বা দড়ির ব্যবহার করিত। দড়িগুলি কানের উপর দিয়া ঝুলানো থাকিত। ইহা যাহাতে স্বস্থানে থাকে তজ্জন্য বতুগ্রন্থি বা কয়েকটি গ্রন্থি এক সঙ্গে যুক্ত করিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মাঝে মাঝে কপাল হইতে খসিয়া পড়িয়া যাইত এবং নাকের সংযোগস্থলে বাধিয়া

যাইত। এমনি করিয়া নাকের সংযোগস্থলকে ব্যবহারের চিন্তা আসে। নাকের সংযোগস্থল এবং কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানকে ব্যবহারের উপযুক্তস্থল ধরিয়া লওয়া হয়। তথাপি নাকের সংযোগস্থলে



ছবি—২৬

দণ্ড এবং কানের উপর দিয়া ঘুরাইয়া দড়ি ব্যবহার করা হইত, পিছনে সংবদ্ধ করিবার জন্য। কাঠ, লৌহ ও অন্যান্য পদার্থই ইহাতে ব্যবহৃত হইত। অবশেষে উপর দিয়া ঝুলানো দড়ির প্রান্তে ভার বাঁধার ব্যবস্থা পরিত্যাগ করা হয়। পরিবর্তে নমনীয় ধাতব ফ্রেমকে কানে ব্যবহার করা হয়। ফ্রেমের বর্তমানকালের আধুনিকতম সংস্করণ হইল প্রযুক্তিবিদ্যা ও কৃত্রিম বস্তু উদ্ভাবনের ফলশ্রুতি।

চক্ষু-যক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

চোখের ক্ষয়রোগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেন মোট্রেজান (Mottrejan) ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে। তাঁহার পূর্বেও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যক্ষার সঙ্গে চোখের ক্ষয়রোগের কিছু আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা যথেষ্ট ছিল না।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে লেনজেন বেক (Langen Back) চোখের কৃষ্ণমণ্ডলীর যক্ষা বর্ণনার পূর্বে সরাসরি রোগীর কাছ হইতে রোগের উপসর্গগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কৃষ্ণমণ্ডলীর সিলিয়ারী যক্ষা প্রথমে ধরা পড়ে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মৌজের (Mauz) চেষ্টায়। ইহার আরো ভাল বর্ণনা দেন মিঃ গ্রেডীনিগো (Gredinigo) ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। জোড়নপেশী ও অচ্ছদপটের যক্ষা প্রথমে আলোচনা করেন কেষ্টার (Koester) রায় (Roy) এবং এলভারেজ (Alvarez) যথাক্রমে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ও ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। অক্ষিগোলকের অচ্ছদ আবরণের (Sclera) যক্ষার জন্যে যে যে উপসর্গ দেখা দেয় তাহার বর্ণনা দেন ডাইনোক (Dianouk) ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। যক্ষা দ্বারা চোখের বিভিন্ন অন্তঃপেশী আক্রান্ত হয় যাহার উপসর্গ বর্ণিত হয় চলতি শতাব্দীর প্রথম দিকে। এই ব্যাপারে ওয়াডেন বার্গ ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া চক্ষু-যক্ষার নির্ণয়ের পথ সুগম করিয়া দেন। এই রোগ নির্ণয়ে কক্সের (Kocks) ধারণা ও রিক্সেসর পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অংশীদার।

উপসর্গসমূহ

চক্ষু-যক্ষার উপসর্গগুলি বড় পরিবর্তনশীল। সাধারণতঃ দুই রকমে উপসর্গগুলি সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ এলার্জির দ্বারা। শরীরের টিউবারকুলিন প্রোটিন শোষণের ফলেই এলার্জি উপসর্গগুলি দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ সরাসরি জীবন্ত যক্ষা জীবাণুগুলি অক্ষিপেশীকে আক্রমণ করে। উপসর্গগুলির প্রকাশ কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন হাইপার সেনজিটিভিটি ও শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর।

ক্ষয়রোগে আঁখিপাতা

যক্ষায় নয়ন-পল্লবের যত রকম ক্ষযক্ষতি হইতে পারে তাহার ভিতর লুপাস ভালগারিস অন্যতম। চোখের এই ক্ষতি মুখের যে-কোন জায়গার যক্ষার স্থানান্তর মাত্র। লুপাসদানার ভিতর জমিয়া থাকে ছোট ছোট কণা। এই কণাগুলি ক্ষয়রোগের জীবাণুর গুচ্ছ। যক্ষায় যাহা সাধারণতঃ বড় আকারে ঘায়ের প্রান্তদেশে পাওয়া যায়। ঘা টানাপড়ার আক্রান্ত স্থানের মধ্য-খানে বেশী পরিলক্ষিত হয়। পাতার বাহির বেড়িয়ে আসল পরি-ণতি হইল ঘা হওয়া ও টানাপড়ার আসল রূপ।

চোখের অস্থিকোটার ক্ষয়রোগ

চোখের অস্থিকোটার ক্ষয়রোগ অতি বিরল। এই রোগ শরীরের অন্য অঙ্গ বা কাছাকাছি কোন স্থান হইতে অক্ষি-কোটারকে আক্রমণ করে। ইহার ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ও প্রণালী অন্য জায়গার ক্ষয়ক্ষতির মতই।

নেত্র-থলির ক্ষয়রোগ

ক্ষয়রোগে সাধারণতঃ নেত্র-থলি আক্রান্ত হয় না। আক্রান্ত অবস্থায় সাধারণতঃ নেত্র ভগন্দর (Lacrimal-fistulla) হইয়া

থাকে। নেত্রনালী হইতে পুঁজ বা পানি পড়া এবং স্থানিয়ভাবে ফুলা ছাড়া আর কোন উপসর্গ দেখা যায় না।

জোড়নপেশী বা কনজাংটাইভার (Conjuntiva) ক্ষয়রোগ

জোড়নপেশীর ক্ষয়রোগ খুব কম। যখন হয় তখন ইহা, হয় প্রাইমারী অথবা সেকেণ্ডারী হিসাবে হইতে পারে। প্রাইমারী ক্ষয়রোগ দেখা দিলে জোড়নপেশীর বিচ্ছিন্ন কোন স্থান থেকে রোগজীবাণুর সোজাসুজি অনুপ্রবেশ ঘটে। সাধারণতঃ এক চোখে হয়। সাধারণতঃ ২০ বৎসর বয়সের উপরের লোকের কম হইয়া থাকে। মহিলারা পুরুষ থেকে বেশী সংখ্যায় আক্রান্ত হয়। ইহার উপসর্গগুলি খুব মন্থর গতিতে দেখা দেয়। উপসর্গগুলি হইল পানি পড়া, আঠালো শ্রাব নির্গত হওয়া, জোড়নপেশী ও কানের সম্মুখের ম্যাকজিলারী গ্রন্থি (Maxillary gand) ফুলিয়া যাওয়া। জোড়নপেশীতে ছোট ছোট দাগ পড়ে এবং জমে। দানাগুলি একত্রিত হয় এবং শুকাইয়া গেলে কুচকিয়া যায়।

স্থানান্তরিত যক্ষায় জোড়নপেশী

সেকেণ্ডারী টাইপে আশেপাশের কোন অঙ্গ হইতে সংক্রমিত হয়। সেই স্থানগুলি হয় আঁখিপাতা বা অস্থির যক্ষা হইতে।

এই ধরনের যক্ষা সাধারণতঃ ২০ বৎসরের অনূর্ধ্ব লোকদের দেখা দেয়। এই অবস্থায় কানের সম্মুখভাগের গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে না। ইহার উপসর্গগুলি নানাভাবে দেখা দিতে পারে। যেমন ছোট ছোট মেলন সিডের (Melon-seed) মত ঘা হয়। ঘা জোড়নপেশীর অন্তঃগ্রন্থিগুলিকে ধূসর দানা করিয়া ফুলা দেখায়। পেডাংকুলেটেড পলিপ (Pedunculated polyp) (বুটার মত) অথবা জোড়নপেশীর লুপাস ফ্লিকটি নিউলার কনজাংটাইভাইটিস, ফ্লিকটি নিউলার কেরাটো কনজাংটাইভাইটিস বহু এলার্জি রোগের

উপসর্গ। চক্ষু যক্ষা তাহার একটি মাত্র। বেশীর ভাগের মতামত হইল যে টিউবারকুলিন এই উপসর্গের প্রধান কারণ। দানা প্রসবকারী জোড়নপেশী অন্যান্য রোগের সাথে ইহার যথেষ্ট মিল আছে। অচ্ছদপটের বিভিন্ন ঘায়ের সাথে ইহার যথেষ্ট মিল থাকিতে পারে। এলার্জি অবস্থার সাথে জোড়নপেশীর যক্ষার যথেষ্ট মিল থাকিতে পারে। সবচাইতে জলন্ত প্রমাণ হইল যে টিউবারকুলো প্রোটিন বা এক ধরনের সাধারণ টিউবারকুলা যাহা এই রোগের কারণ। ফ্লাকটিনার নামে যে রোগ আছে, তাহা হইল ছোট ছোট দানা জোড়নপেশীর উপর লিম্বাসের ঠিক নিকটে বা অচ্ছদপটের উপর দেখা দেয়। ফ্লাকটনের (Phlecten) আশেপাশে জোড়নপেশীগুলি লাল থাকে।

অচ্ছদপট (Cornea)

অচ্ছদপটের যক্ষার প্রকাশ ঘটে ইণ্টারস্টিসিয়াল কেরাটাইটিস (Interstitial Keratitis) রূপে। অচ্ছদপটে গভীর প্রদাহ, যক্ষার প্রদাহ হইল যক্ষাজীবাণু অনুপ্রবেশ করিয়া সৃষ্টি করে। ইস্ক্লেরো কেরাটাইটিস (Sclero-Keratitis), মারজিনিয়াল কেরাটাইটিস এবং অচ্ছদপটের অস্বচ্ছ আবরণ হইতে ইস্ক্লেরা ও কৃষ্ণমণ্ডলীতে সংক্রমণ ঘটিতে পারে। অচ্ছদপটের প্রদাহকে ইংরাজিতে কেরাটাইটিস বলে। অচ্ছদপটে অস্বচ্ছ আবরণের যক্ষার প্রকৃতি হইল এই যে প্রথমে একটি ট্রাংক হওয়া এবং আসল ট্রাংক দুই তিনটি শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত করা। ইহা গোটা অচ্ছদপটকে বিভিন্নভাবে ভাগ করিয়া ফেলে। পরে শাখা-প্রশাখাগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া গোটা উপরের স্তরে বিস্তার লাভ করে। পরে ক্রমাগত নিম্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়িবার আগ্রহ লইয়া আগাইয়া চলে। এই হইল টিউবারকুলার ইনটারষ্টিসিয়াল কেরাটাইটিসের আসল রূপ।

ডিপ সেণ্ট্রাল কেরাটাইটিস (Deep central keratitis) বা কেন্দ্রবর্তী গভীর প্রদাহ

এই অবস্থায় প্রথমে অচ্ছদপটের অন্তঃনিম্ন স্তরটি যক্ষা জীবাণুতে অনুপ্রবেশ করিয়া ধূসর বর্ণ ধারণ করে। পরে ইহার জের কৃষ্ণমণ্ডলীতে খুব বেশী পরিমাণে প্রতিফলিত হয় না। অচ্ছদপটের অন্তঃবর্তী প্রদাহস্থানটি অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে। ইপিস্‌ক্লেরাইটিস এলার্জিক অবস্থা যাহা অনেক সাধারণ অসুখ থাকিয়া হইতে পারে। শরীরে যেমন বাত গ্রন্থিবাত, কোন প্রদাহ স্থান বা পেটের কৃমি থাকিয়া, যক্ষা তাহাদের ভিতর একটা—যক্ষায় অস্বচ্ছপটের প্রদাথের আসল ছবি হইল ইস্‌ক্লেরাইটিস ও ইপিস্‌ক্লেরাইটিস। ইহা সরাসরি যক্ষা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। অক্ষি-গোলকর মেরুপ্রদেশের সাথে সম্বন্ধ রাখিয়া এই রোগ সম্মুখ বা পিছন থেকে আক্রমণ করিতে পারে। কাজেই উপসর্গগুলি হইল চোখ ব্যথা করা বা টেনোনাইটিস হওয়া। যদি রোগের বিস্তার অক্ষিগোলকের পিছন হইতে লাভ করে, তবে উক্ত চোখের উপর পাতার কিছু গরমিল, ফুলন বা ঝুলন (Ptosis) ঘটে এবং চোখের নড়াচড়ার মাত্রা কমিয়া যায়।

যক্ষায় কৃষ্ণমণ্ডলী (Uveal tract)

প্রান্তভাগে দানা বেঁধে কণিকা (Granular Iitis) প্রদাহ হিসাবে শুরু হয়। ছোট ছোট দানা কণিকার উপর জমা হয়। পশ্চাদদিকে যে-কোন রকমে সম্প্রসারিত হইতে পারে। যেমন গোলাকার কৃষ্ণমণ্ডলীর প্রদাহ ক্রমশঃ মণ্ডলীতে ছড়াইয়া পড়া। কৃষ্ণমণ্ডলীর সীমিত যক্ষা (Solitary tobuerculosis of the choroid), পড়ে কণিকার গ্রেনোলোমেটাস টিউবার কুলোসিস্‌ ছোট ছোট দানাগুলি আকারে ছোট, ধূসর রংয়ের প্রদাহ উপর

বা পাশে ইহার অস্তিত্ব-এর প্রমাণ হিসাবে বর্তমান থাকে। গ্রেনো-লোমেটাস আইরাইটিসএ কপি নোডিউলস (Koeppe nodules) এবং ম্যাটন ফ্যাট জাতীয় কেরাটিক ডিপোজিট পাওয়া যায়।

কৃষ্ণমণ্ডলের গোলাকার প্রদাহ (Circumscribed choriditis)

ইহা সাধারণতঃ ২০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধ বয়সের লোকদের দেখা দেয়। দৃষ্টিবিন্দু (Macula)-কে আক্রমণ করিবার লিপসা খুব বেশী। অস্পষ্ট একজুডেট হিসাবে পিছনের দিকে জমে। কযেক সপ্তাহে গোলাকার হইয়া পরিসমাপ্তি ঘটায়। ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে ঘটিতে পারিধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমাগত দৃষ্টি-শক্তির অবনতি ঘটে।

অক্ষিপট বা রেটিনার যক্ষা

ইহার উৎস হইল কৃষ্ণমণ্ডলের পশ্চাদাংশ হইতে কোন টিউবার-কল বা যক্ষার ক্ষত ফাটিয়া অক্ষিপটে বিস্তার লাভ অথবা রক্ত দ্বারা প্রবাহিত হইয়া অক্ষিপটে সংক্রামিত হওয়া অথবা নিকটবর্তী অঙ্গ হইতে আক্রান্ত হওয়া। জীবাণু সংক্রমিত একজুডেটগুলি অক্ষিপটের উপরের দিকে থাকে, সংখ্যায় অনেক বা একও হইতে পারে। কিন্তু সবসময় গোলাকার।

পেরীফ্লেবাইটিস (Periphlebitis)

ইহা সর্বজনবিদিত যে ইলস (Ealeas) রোগ নামে যে রোগ আছে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ হইল যক্ষা, যদিও ইহা একমাত্র কারণ নহে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে হেনরী ইলস নব্য যুবকদের চোখের ভিট্রোস (Vitrous)-এর ভিতর রক্তক্ষরণ দেখিতে পান। এই-ভাবে এই রোগের নামকরণ হয়। বারে বারে রক্ত জমা আবার মিলিয়ে যাওয়া ঘটিতে ঘটিতে যোগাযোগ পেশীর সৃষ্টি হয়, পরে যাহা কুচকিয়ে অক্ষিপটকে স্থানচ্যুত করে। রোগটাকে

সরাসরি পরীক্ষা করিলে হয় কেন্দ্র বা পরিধিতে পেরিস্‌ক্লেরাইটিস হিসাবে দেখা দেয়। এই অবস্থায় যক্ষা জীবাণুর সন্ধান না পাওয়া গেলেও হিসটোলজিক্যাল (Histological) নমুনা যেমন লিম্ফোসাইটস (Lymphocytes) ইপিথেলোইড সেল (Epithe-loid cell) চারিদিকে দেখা যায়।

তাছাড়াও থ্রোমবসিস্‌ ভেরিসেস ও এ্যানোরিজম (Thro-mbosis varices and anurismal) এর সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধরনের পরিবর্তন যক্ষায় সৃষ্টি করে। পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় ব্যবহৃত পশুগুলির চোখে যক্ষা জীবাণু দ্বারা এই ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় বলিয়াই অনেকে মনে করেন যে, চক্ষু-যক্ষা এই রোগের একটি প্রধান কারণ।

ছানি কাটার পর

চোখের ছানি পড়া (cataract) সাধারণতঃ বার্ধক্যজনিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঃ

(ক) চোখের অসুখ, চোখের আঘাত, শরীরের অন্য রোগজনিত অথবা জন্মগত হইতে পারে, চোখের রোগের মধ্যে আইরাইটিস (Iritis) আইরিডো-সাইক্লাইটিস (Iridocyclitis), রেটিনাল ডিজেনারেটিভ গ্রুপ।

(খ) চোখের আঘাতের ভিতর সাধারণতঃ কোন ভোতা জিনিসের আঘাত, ফুটবল, ক্রিকেট বলের আঘাত, গরু, ছাগলের শিংএর গুতা, এক্সরে বা রেডিয়েশনজনিত (Radiation) আঘাত।

(গ) শারীরিক অসুখের মধ্যে ডায়াবেটিস (Diabetes) কয়েক রকমের চর্মরোগ যথা পয়কিলোডারমা (Poikiloderma) ইস্ক্লেরোডারমা (Scleroderma) ইত্যাদি এবং এনডোক্রাইন জাতীয় অসুখ।

উপরোক্ত যে-কোন কারণে এক বা দুই চোখের ছানি হইতে পারে। যদি এক চোখে ছানি হইয়া থাকে তবে অন্য চোখের দৃষ্টিশক্তির উপর রোগগ্রস্ত চোখের অপারেশনের পরবর্তী সমস্যা অনেকটা নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া বয়সের জন্যও ছানি কাটিবার পরবর্তী সমস্যা বিভিন্নতর হইতে পারে। আমরা এইখানে সাধারণতঃ বার্ধক্যজনিত (Senile cataract) কারণে যে ছানি হয় এবং উহা কাটিবার পর যে সমস্যা সৃষ্টি হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা লইয়া আলোচনা করিব।

ছানি কাটিবার পর চোখের যে অবস্থা হয় তাহা হইতেছে চোখের উপযোজন ক্ষমতা হারাইয়া ফেলা (Loss of accommodation), প্রতিচ্ছবি বড় হইয়া যাওয়া, দুই চোখের প্রতিচ্ছবির গরমিল হওয়া ইত্যাদি। যদি এক চোখের ছানি কাটা হয় এবং উহা পরবর্তী সময়ে পাওয়ারের চশমা দিয়া দৃষ্টিশক্তি অর্জন করা যায় এবং অন্য চোখে দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক থাকে, তবে ছানি কাটা চোখের প্রতিচ্ছবি স্বাভাবিক চোখের প্রতিচ্ছবি হইতে ৩৩% (শতকরা তেত্রিশ) বড় হইয়া থাকে। শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত প্রতিচ্ছবির আকারে পার্থক্য একত্রগত করিবার ক্ষমতা মস্তিষ্কের রহিয়াছে। ইহার ঊর্ধ্বে কোন বস্তু দুইটি হিসাবে দেখা যায় এবং তখনই দ্বিদর্শন (Double vision) অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া চশমা ব্যবহার করিবার দরুন পেরিফেরাল ডিসটরশন (Peripheral distortion) ভ্রাম্যমান অন্ধবিন্দু (Roving Scotoma) সৃষ্টি হইয়া থাকে। ছানি কাটিবার পর +১০ ডায়েপটার শক্তি সম্পন্ন চশমা সাধারণতঃ ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে ছোট জিনিস তাহার আকারের তুলনায় বড এবং কিছুটা বিকৃত দেখায়। দৈনন্দিন জীবনে সেইজন্য পানি খাওয়ার গ্লাস ধরিতে কিংবা লেখার কলম অথবা দরজা ধরিতে বিকৃত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। গ্লাস যত বড় মনে হয় অথবা চায়ের পেযালা কিংবা নাস্তা করিবার চামচ যত বড় মনে হয় আসলে তাহা তত বড় নয়। ফলাফল দাঁড়ায় যে গ্লাস ধরিতে গিয়া হাতের ভিতর দিয়া পড়িয়া যায় অথবা লেখার কলম বার বার ধরিবার চেষ্টা করিতে হয়। একই কারণে খাইবার সময় কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করিয়া চামচ দিয়া খাইতে গেলে অসুবিধাটা আরও বেশী মনে হয়। কিছুটা দূর হইতে দরজা কিংবা জানালার দিকে তাকাইলে তাহার মাঝখান অনেকটা সরু ও

বাঁকা দেখা যায়। কিন্তু কাছে গেলেই সঠিক আকার এবং প্রশস্ততা ধরা পড়ে। ফলাফল দাঁড়ায় যে, কোন দরজা দিয়া বাহির হইতে গেলে এমন লোক ইতস্ততঃ করিতে থাকে। কারণ তাহার কাছে দরজা সরু ও বাঁকা মনে হয় এবং এইরূপ অবস্থায় গায়ে লাগিতে পারে বলিয়া মনে হয়। অথচ অতীত অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে এইটা দরজা এবং সহজে ইহার ভিতর দিয়ে যাওয়া আসা করা যায় এবং এখনও লোকজন যাতায়াত করিতেছে। বৃদ্ধ বয়সে একে তো স্মরণ শক্তির স্বল্পতা, শারীরিক দুর্বলতা এবং বোধ শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে, তদুপরি হাত-পা বা মাথার কাঁপুনি বা ঝাঁকুনিতে উপরোক্ত অসুবিধাগুলিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই দেখিবার যতটা অসুবিধা থাকে বার্ধক্যজনিত স্বাভাবিক অসুবিধা-গুলির জন্য দৃষ্টির অসুবিধা একটা বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করিয়া থাকে। পুরু কাচের জন্য দৃষ্টিক্ষেত্রের এক পাশে একটা দৃষ্টিহীন বা অন্ধকার এলাকার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাও আবার ভ্রাম্যমান অন্ধবিন্দু (Roving Scotoma) অর্থাৎ চোখ নড়াচড়া করিবার সাথে কালো এলাকাও নড়াচড়া করিয়া থাকে।

হাসপাতাল ছাড়িবার পরেই প্রথম দিকে কালো চশমা সব সময় ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে যেমন হঠাৎ অত্যধিক আলোর প্রভাব হইতে চোখকে রক্ষা করা যায় তেমনি ধূলাবালি বা বাতাসের সহিত মিশ্রিত দুষিত পদার্থ হইতেও চোখকে রক্ষা করা সম্ভব। অপারেশনের জায়গা যদিও শুকিয়ে যায় তথাপি সম্পূর্ণ সুস্থতা ও অপারেশনের পূর্ববর্তী চোখের অবস্থা এবং অন্ধত্বের পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা আনয়নের জন্য চোখের নড়াচড়া যথাসম্ভব কম করা উচিত। সেই হিসাবে প্রথম দিকে কেবলমাত্র মধ্যখানে দৃষ্টি প্রখর এবং আশপাশ বন্ধ থাকে, এইরূপ চশমা ব্যবহার ফলপ্রদ।

ঔষধপত্রের ব্যবহার

চিকিৎসকের পরামর্শমত লওয়া প্রয়োজন। যিনি অপারেশন করিয়াছেন কিংবা ছানি কাটিয়াছেন, যেহেতু অপারেশন-পূর্ববর্তী অবস্থা তাঁহার ভাল জানা আছে সেইহেতু অপারেশন-পরবর্তী অবস্থার চিকিৎসা তাঁহারই পরামর্শানুসারে করা উচিত। পাওয়ারের চশমা লইবার পর চলাফেরার যে অসুবিধা হয় তাহা দুর করিবার জন্য ধীরে ধীরে অভ্যাস করিতে হয়। অনেক জায়গায় চক্ষু হাসপাতালের সংলগ্ন এই ধরনের রোগীর জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র থাকে। পুনর্বাসন কেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে রোগীর নিজের আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবকে সে প্রশিক্ষণের ভার লইতে হইবে। চিকিৎসকের পরামর্শ-মত প্রথম দিকে চলাফেরার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। একজন লোক হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে পা ফেলা, সিঁড়ি দিয়া উঠা সমতল-অসমতল পার্থক্য বোধ করা একটা নির্দিষ্ট নিয়মে মাসখানেক এইরূপ শিক্ষা দিলে, রোগীর দৃষ্টিশক্তির স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসে।

এক চোখ কিংবা দুই চোখের অপারেশনের পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সমাধান করা সম্ভব। হয়ত বা এক চোখে ফ্রস্টেড গ্লাস (Frosted glass) অন্য চোখে পাওয়ারের চশমা অথবা এক চোখে পাওয়ারের চশমা অন্য চোখে প্লেন (Plane) চশমা ব্যবহার করা যাইতে পারে। অবস্থা বিবেচনায় এর যে-কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। মোট কথা চশমা লইবার পর রোগীকে ধীরে ধীরে দৃষ্টি, পরিবর্তিত অবস্থার স্বাভাবিকীকরণ করিতে হয় যাহা সময়ে অভ্যাসে পরিণত হইয়া থাকে।

নতুন চশমা ব্যবহারে অসুবিধা ও ইহার প্রতিকার

প্রথম প্রথম নতুন চশমা ব্যবহার করিতে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এই সমস্ত অসুবিধা সাধারণতঃ সাময়িক, এক সপ্তাহ হইতে সপ্তাহ তিনেক থাকে, কদাচিৎ দুই তিন মাস থাকিতে পারে। ইহা অনেকটা অস্বাভাবিক।

কোন কোন সময় সমতল জায়গা, জমিন, টেবিল ইত্যাদি বাঁকা, ঢালু, অথবা দুমড়ানো দেখা যাইতে পারে। সমান্তরাল বাহু যেমন দরজার দুই চৌকাঠ, জানালার চৌকাঠ, জানালার শিকগুলি কোন এক প্রান্ত অন্য প্রান্তের চাইতে সরু দেখাইতে পারে। সিঁড়ির ধাপে ধাপে চলিতে অসুবিধা, অনেক সময় সিঁড়ির ধাপের উচ্চতা ভুল করা কোন জিনিসের গভীরতা এবং দুই উচ্চতার পার্থক্য নির্ণয়ে সঙ্কোচ, সন্দেহ বা দ্বিধার সৃষ্টি হইতে পারে। আবার অনেক সময় সত্যিকার বৃত্তাকার জিনিসকে পূর্ণ বৃত্তাকার মনে নাও হইতে পারে। সেইরূপ চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ অথবা অন্য কোন আকৃতির জিনিস ঠিক তদ্রূপ মনে নাও হইতে পারে। কোন কোন সময় সোজা জিনিসকে বাঁকা দেখা যাইতে পারে। দুরের জিনিস চশমা দিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ এবং চশমা ছাড়া স্বচ্ছ দেখা যাইতে পারে। আবার চশমা দিয়া কোন সময় নিকটের জিনিস একটু অস্বচ্ছ, বিশেষ করিয়া লেখাপড়া করিতে একটু অসুবিধা হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু দুরের জিনিস চশমা দিয়া পরিষ্কারই দেখা যায়। এইগুলি চশমার পাওয়ারের উপর নির্ভর করে—আর চশমার পাওয়ার নির্ভর করে চোখের দৃষ্টিশক্তির অবস্থার উপর।

বাইফোকাল চশমাতে নিকট দৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত অংশ ঠিক চোখের সম্মুখে না পড়িলে লেখাপড়া করা বা নিকটের জিনিস দেখিতে অসুবিধা হয়। ঠিক তদ্রূপ দূরের জিনিস দেখিবার জন্য ব্যবহৃত অংশ দূরে দেখিবার সময় ঠিক চোখের সামনে না পড়িয়া যদি নীচের অংশ চোখের সামনে পড়ে তবে দূরের জিনিস অস্পষ্ট দেখা যায়। দুই অংশের সংযোগস্থলে দৃষ্টি পড়িলে নানা রংয়ের আলো দৃষ্টিগোচর হয় এবং দ্বিদর্শনের সম্ভাবনা থাকে। আবার অতি দ্রুত চোখ এক অংশ হইতে অন্য অংশে নড়াচড়া করিবার সময় বস্তু নড়িয়া উঠিতে পারে। সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে গেলে পা পিছলানোর সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু নিকট দৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত অংশ দিয়া দেখিলে সিঁড়ি ফোকাসের বাহিরে পড়ে বলিয়া সত্যিকারের দূরত্ব হইতে দৃষ্ট দূরত্ব কম মনে হয়। এইজন্য বাইফোকাল চশমা দিয়া নীচের দিকে দেখিতে গেলে কেবল চোখ না ঘুরাইয়া মাথা নীচের দিকে ঘুরাইতে হয়। এই অভ্যাস করিতে একটু সময় লাগে। আবার পড়িবার সময় মাথা না নড়াইয়া কেবল চোখ নীচের দিকে ঘুরাইতে হয়, যাহাতে দৃষ্টি চশমার নীচের দিকের ছোটো অংশে আপতিত হয়। ইহাতে চোখের উপর কিছুটা চাপ পড়ে। যেহেতু নিকট-দৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত অংশ ছোট এবং সীমিত সেহেতু পড়িবার সময় লাইনের প্রথম অংশ হইতে শেষের অংশ দেখিবার জন্য কেবল চোখ না ঘুরাইয়া মাথা ঘুরাইলে দৃষ্টি পরিষ্কার থাকে। কেবল চোখ ঘুরাইলে দৃষ্টি চশমার বাহিরের অংশে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ইহাতে দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়।

প্রথম বারে একটু বেশী পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করিতে গেলেই মাথা ধরিয়া যাওয়া, বমি বমি ভাব হওয়া অস্বাভাবিক বা বিচিত্র নয়।

চশমা ছাড়াও ফ্রেমের জন্য কতকগুলি অসুবিধা হইতে পারে। কানের উপরে ব্যথা, নাকের উপরে চাপ লাগা ও ব্যথা হওয়া মাথা ধরা নাক ও চোখের আশে পাশে দাগ পড়া ইত্যাদি হইতে পারে। কণ্টাক্ট ডারমাটাইটিস (Contact dermatitis) যাহা আঁখি-পাতা এবং নাকের অথবা চোখের আশে পাশের স্থানে একটি বিশেষ চর্মরোগ হিসাবে দেখা যাইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ এবং ফ্রেম তৈয়ারীর বস্তুবিশেষের পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপর ইহা নির্ভর করে। ছানি কাটার পর উচ্চশক্তির চশমা ব্যবহার করার অসুবিধা ও ইহার প্রতিকার অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে।

জানিয়া রাখা উচিত চশমা ব্যবহারের অসুবিধা নিম্নলিখিত যে-কোন কারণে হইতে পারে :

(১) কোথাও কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র প্রথম চশমা ব্যবহার করার জন্য অসুবিধা।

(২) নিয়মমত বা ঠিকমত চশমা ফিটিং না হওয়া।

(৩) প্রেসক্রিপসন মত চশমা না হওয়া।

(৪) প্রেসক্রিপসনের ভুল থাকা।

(৫) চোখের অথবা চশমার বিশেষ স্বভাবগত দোষ যাহা এইরূপ চশমায় দুরীভূত হয় না।

(৬) কাচের নিজস্ব ধর্ম আছে এবং সেইজন্য চশমায় ব্যবহৃত কাচে সেই ধর্মের বা দোষগুণের জন্য কতকটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা চোখে অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে। কোথাও কোন দোষত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও প্রথমবার চশমা ব্যবহারের যে-সমস্ত অসুবিধা হয় তাহাই উপরে মোটামুটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইহা সাময়িক, স্বল্পস্থায়ী। চশমা ব্যবহারেই দুর হইয়া যাওয়া উচিত। তাই প্রথম চশমা ব্যবহার করার দুই তিন দিন পরেই অপটিসিয়ান বা যে চশমা সরবরাহ করিয়াছে তাহাকে অসুবিধা

গুলি জানান উচিত। চশমা সেণ্টারিং, আন্তঃচক্ষু দূরত্ব, নাসিকা মুলে চশমা স্থাপন, চক্ষু হইতে চশমার দূরত্ব, চোখের আনু-পাতিক চশমার অবস্থা ইত্যাদি কোথাও কোন দোষ থাকিলে তাহা ঠিক করাইয়া লইতে হইবে।

সপ্তাহখানেক ব্যবহারের পরেও কোন অসুবিধা থাকিলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে। চশমা ব্যবস্থাপত্র মত দেওয়া হইয়াছে কিনা ইহাই প্রথম পরীক্ষণীয় বিষয়। না হইয়া থাকিলে চশমাকে ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী করাইয়া লইতে হইবে। উপরে বর্ণিত অসুবিধাগুলির কতকগুলি কেবল ব্যবহারের অভ্যাসেই দুরীভূত হইয়া যায়। ব্যবহার করিবার নিয়ম একটু ধৈর্য সহকারে কয়েক দিন পালন করিলেই ইহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়, যাহার পরিণাম আরাম, শান্তি ও স্পষ্ট দৃষ্টিশক্তি।

কর্মক্ষম অন্ধ

যাহার চোখের আলো নাই তাহার জীবনের আলোও নাই এমন বলা যায় না। অন্ধ নিজকে নিজের জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বরকমে তৈরী করিতে সক্ষম। অন্ধকে যদি আমরা জানিতে চাই অন্ধের দুঃখকে উপলব্ধি করিতে চাই তাহার সমস্যাকে সমাধান করিতে চাই তবে প্রথমে আমাদের জানিতে হইবে অন্ধের সংজ্ঞা কি এবং অন্ধের প্রতি আমাদের কতটুকু করিবার সামর্থ্য আছে।

সাধারণতঃ আমরা অন্ধ বলিতে মনে করি যাহার দুই চোখ নাই অথবা দুই চোখে কিছুই দেখিতে পারে না। আসলে কেবল ইহাই অন্ধের সম্পূর্ণ সঠিক সংজ্ঞা নহে। বস্তুতঃপক্ষে যে দুই চোখে সামান্য দেখে কিন্তু ওই সামান্য দৃষ্টিশক্তির দ্বারা কোন রকম কাজ কর্ম করিতে পারে না এমন কি নিজের চলাফেরা করিতেও কষ্ট হয় সেও প্রকৃতপক্ষে অন্ধ।

অন্ধত্ব এক চোখে বা উভয় চোখে হইতে পারে। ইহা আবার হঠাৎ বা ধীরে ধীরেও হইতে পারে। ইহার কারণের ভিতর জন্মগত, কোন রোগ বা দুর্ঘটনাজনিত কারণই প্রধান। হঠাৎ এক চোখের দৃষ্টিহীনতা সাধারণতঃ ভিট্রিয়াসের (Vitreous) রক্তক্ষরণ, সেণ্ট্রাল রেটিনাল আরটারি থ্রম্বসিস (Central retinal artery thrombosis), সেণ্ট্রাল রেটিনাল ভেইন থ্রম্বসিস (Central retinal vein thrombosis) অথবা সেণ্ট্রাল রেটিনাল ভেইন অবস্ট্রাকসান, মেকুলায় রক্তক্ষরণ। ইহা ছাড়া অত্যধিক রক্তচাপ, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, রেটিনাল ডিটাচমেণ্ট ইলশ ডিজিজ, অক্ষিপটের প্রদাহ পেরি আরটেরাইটিস ইত্যাদি।

সেন্ট্রাল রেটিনাল আরটারির বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ হইল থ্রম্বসিস অথবা এমবোলিজম, যাহা আরটারিও ইসক্লেরোসিস রোগে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেইন সাধারণতঃ ফ্লেবাইটিস এবং চোখের অন্তস্থ কোন টিউমার গ্লুকোমা, স্কারভী, হিমোফিলিয়া ইত্যাদি নানা রোগে হইতে পারে। হঠাৎ দুই চোখ অন্ধ হওয়ার কারণ হইতেছে, (১) অত্যধিক মদ্যপানের বিষক্রিয়া, (২) কুইনাইনের বিষক্রিয়া, (৩) ইউরেমিয়া রোগ, (৪) হিষ্টিরিয়া। আস্তে আস্তে দৃষ্টিহীন হওয়ায় এক চোখে বা উভয় চোখে হইতে পারে। ইহাও আবার ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে। ছানিপড়া, অচ্ছদপটের স্বচ্ছতা হারিয়ে যাওয়া, অচ্ছদপটের প্রদাহ (Keratitis) বর্ধিষ্ণু টেরিজিয়াম (Advancinig Pterygium) অক্ষিস্নায়ুর অবক্ষয় (Optic Atrophy) গ্লকোমা (Glaucoma), ইহাছাড়া অত্যধিক মদ্যপান, অত্যধিক ধূমপান (Tobacco Amblyopia)। কোন কোন পেশাগত কারণেও অসাবধানভাবে কাজ কর্ম করিবার জন্য দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পাইতে পারে। যেমন ছাপাখানায় সিসা দিয়া কাজ কর্ম করিবার সময়, (Lead-Poisoning) গরম চুল্লীতে কাজ করিলে ছানি পড়া সৃষ্টি হইতে পারে। ভিটামিন 'এ' এর অভাবে জেরোসিস্ .(Xerosis), কেরাটোমেলেশিয়া (Keratomalacia), রাতকানা (Night Blindness) ইত্যাদি হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কৃমি বেশীর ভাগ লোকেরই হইয়া থাকে। সেই কৃমির আক্রমণের জন্য পেটের অসুখ এবং পুষ্টির অভাব হইয়া থাকে। আবার খাদ্যে প্রোটিনের অভাবও থাকিয়া থাকে। সেই প্রোটিনের অভাবের সাথে পেটের কৃমি জড়িত হইয়া নানা রোগের সৃষ্টি করে। . কেরাটোমেলেশিয়া (Keratmalacia) সাধারণতঃ ৬ মাস বয়স হইতে ৩ বৎসর বয়সের মধ্যেই বেশী হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় ছোট :ছাট ছেলে

মেয়েদিগকে প্রচুর প্রোটিন এবং ভিটামিন 'এ' সংযুক্ত খাদ্য খাওয়ানো উচিত। তাই দুধ ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়মিত খাদ্য হওয়া উচিত।

অচ্ছদপটের প্রদাহ (Keratitis) সময়ে অচ্ছদপটের ক্ষত হিসাবে দেখা দিতে পারে। সেই ক্ষত শুকাইয়া গেলেও অচ্ছদপটের স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়া যায়। যাহার দরুন অনেকেই দৃষ্টিহীনতায় ভুগিয়া থাকেন। তাই অচ্ছদপটের সামান্য রোগ ও অবহেলা না করিয়া সাথে সাথে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা লওয়া উচিত। পানি বসন্ত (Chicken Pox), গুটি বসন্ত (Small-Pox) রোগের গুটি চোখে উঠিয়া চোখের ক্ষত সৃষ্টি করিয়া থাকে যাহার পরিণাম অন্ধত্ব। এই রোগে ভুগিয়া আমাদের দেশে বহু লোককে অন্ধত্বঃবরণ করিতে হয়। যে-কোন অবস্থাতেই বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা নেওয়া উচিত।

বাংলাদেশে অন্ধের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। বিভিন্ন চক্ষুবিশেষজ্ঞের অভিমতে অন্ধের সংখ্যা যাহা আমরা ধারণা করি প্রকৃত সংখ্যা তাহার চেয়ে অনেক বেশী। অবশ্য এই সংখ্যার ভিতরে এক বিরাট অংশ চোখের ছানি পড়ার জন্য অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এই ছানি পড়ার চিকিৎসা অত্যন্ত সহজ। বাংলাদেশ অন্ধকল্যাণ সমিতি সরকারী ও আন্তর্জাতিক সাহায্যে বৎসরে বহু স্থানে অন্ধত্ব মোচন শিবির স্থাপন করিয়া ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দেশের অনেক হাসপাতালেই ইহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অন্ধের সমস্যা জাতীয় সমস্যা, তাই অন্ধত্ব দুরীকরণ এবং অন্ধকে স্বাবলম্বীকরণ নিঃসন্দেহে জাতি গঠনমূলক সকল সংস্থার সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। বাংলাদেশ অন্ধ কল্যাণ ফেডারেশান সরকারী আন্তর্জাতিক ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে অন্ধকে কর্মক্ষম করিবার নানা রকম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

যে-কোন অন্ধ লোক কর্মক্ষম বা স্বাবলম্বী হইতে পারে। জন্মান্ধ ছোট বেলা হইতেই অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। তাহার স্বাস্থ্য নিয়মিত গড়িয়া উঠিবার জন্য খেলাধূলা পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। লেখাপড়ার বয়স হইলেই নিকটস্থ অন্ধ স্কুলে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা উচিত। এইসব স্কুলে লেখাপড়া ছাড়াও পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোক যেমন লেখাপড়া করিতে পারে, অন্ধও ঠিক সেইভাবে তার নিজস্ব ব্যবস্থায় পড়াশুনা করিতে পারে। অবশ্য এই ব্যবস্থা একজন অন্ধই আবিষ্কার করিয়াছেন। অন্ধই আবার তাহার উন্নতি বিধান করিয়াছেন। মূলে যে লাইন ডট ছিল ব্রেইলি (Brailey) তাহা উন্নত করিয়াছেন। অন্ধ লোকের অনুভূতি শক্তি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তি খুবই প্রখর তাই তাহাদের অনুভূতি শক্তির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইহা অত্যন্ত কার্যকরী হইয়াছে। যে-কোন অন্ধকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন সম্পূর্ণ সক্ষম ও দক্ষ শ্রমিকে পরিণত করা সম্ভব। সাধারণতঃ দেখা যায় অনেক অন্ধ লোক নিজের পরিশ্রমে এবং চেষ্টাতে নানা বিদ্যা বা পেশা অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকেন। এই ঢাকা শহরেই একজন অন্ধ লোককে ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে দেখা যায়। আবার এইখানেই এইরূপ অন্ধকে দ্বারে দ্বারে পত্রিকা বিক্রয় করিয়া নিজের জীবিকা অর্জন করিতে দেখা যায়। অনেকে এমনও আছেন নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া, গান গাহিয়া, কমিক করিয়া হাটে হাটে কোন কোম্পানির জিনিস বক্তৃতা মারফত বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইলেও আমাদের দেশে অন্ধকে কর্মক্ষম, স্বাবলম্বী ও শিক্ষিত করিয়া সক্ষম নাগরিক হিসাবে গড়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অভিভাবককে নিকটস্থ অন্ধ স্কুল অথবা সমাজ কল্যাণ দফতরের

সাথে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। এমন অনেক অন্ধ রহিয়াছেন যাহারা অন্যের চক্ষুদানের সাহায্য পাইলে আবার দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতে পারেন। এমতাবস্থায় চক্ষুদান দৃষ্টিদানেরই নামান্তর। ইচ্ছা করিলে চক্ষুদান করিতে পারেন। হাসপাতালে চক্ষু ব্যাঙ্কে তাহা জমা রাখিয়া প্রয়োজনমত অন্য রোগীর জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। মৃত্যুর পূর্বেই দানপত্র সম্পাদন করিয়া দিলে মৃত্যুর পর সেই চোখ ব্যাঙ্কের লোকজন সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

———

ভ্রম-সংশোধনী

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হইবে
৮	১	Proplosis	Proptosis
১৩	১১	কুশের	কোষের
১৪	৪	ভদুপরি	তদুপরি
১৭	১৫	ক্ষিপাতা	৫। অক্ষিপাতা
১৭	১৯	৯। ফ্যারান্‌কুল	৯। ক্যারানকুল
১৯	২৬	খোলসবিশেষ	খোলস
২৯	১০	দৃষ্ট	দৃষ্টি
৩০	৩	১০০০°	১০০°
৪১	২২	পুঙ্খাপুঙ্খরূপে	পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
৫৬	৭	করিবা	করিবার
৬০	১৩	অবস্থান	অবস্থার
৬৪	৩	তাহা	তাহারা